প্রথম প্রকাশ
মে ১৯৫৩

প্রচ্ছদ
অমিয় ভট্টাচার্য

মুদ্রক ও প্রকাশক
অরুণকুমার দে
র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন
৪৩ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৯

লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্রের
এক দশকের পাঠক
সুমিতা দাস
অঞ্জনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রশান্ত ভট্টাচার্যকে
সপ্রীতি শুভেচ্ছায়—

প্রসঙ্গ কথা

সাহিত্যের ক্ষেত্রে আন্দোলন বলতে তাই বুঝবো যা সাহিত্যকে অন্যখাতে বইয়ে দিয়ে সাহিত্য ধারার পরিবর্তন ঘটায়, গতানুগতিকতাকে অস্বীকার ক'রে নতুনত্বের সন্ধানী হয়, চিরাচরিত ধারাকে সমালোচনার কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়ে সাহিত্যের নানান পরীক্ষা চালায় এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাময়িক কিংবা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রেখে যায়। বিশ্ব-শিল্প-সাহিত্যের আঙ্গিনায় নানান আন্দোলন নানা সময় ঘটে গেছে। ইউরোপ আমেরিকায় শিল্প-সাহিত্যকে কেন্দ্র করে নানা সময়ে নানা মতবাদী গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছে। ইমপ্রেসনিজম্, কিউবিজম, ফভিজম্, স্যুররিয়ালিজম, এক্সপ্রেসনিজম্, ফিউচারিজম্, সিম্বলিজম্ তাশিজম্, রিয়েলিজম, দাদাইজম, আভাগার্দ, এ্যাবস্ট্র্যাক্ট আর্ট, ইমেজিস্ট প্রভৃতি কতই না আন্দোলন! এক একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে এক এক সময়ে শিল্পের এক একটি রীতিকে কেন্দ্র করে। সাহিত্যে যখন নতুন কিছুকে দেখি 'ন্যু ওয়েভ' বা 'নবতরঙ্গ' নামে চিহ্নিত করি। পাশ্চাত্যের যে শিল্প আন্দোলন হয়ে গেছে তার প্রভাব পড়েছে প্রাচ্য সাহিত্যেও। বাংলা সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। হিন্দী প্রতীকবাদী ও ছায়াবাদী আন্দোলন, ওড়িয়া ভাষায় অবধূত গোষ্ঠীর আন্দোলন বা মহারাষ্ট্রের দলিত সাহিত্য আন্দোলনও সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গেছে। যে কোনো ভাষা সাহিত্যের আন্দোলন গড়ে ওঠে সেই ভাষায় প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিনগুলিকে কেন্দ্র করে। বাংলা ভাষা-সাহিত্যে যে সমস্ত আন্দোলনগুলি ঘটেছিল ম্যানিফেস্টো বা ইস্তাহার সামনে রেখে, তারই একটি রূপরেখা আঁকার চেষ্টা করেছি এই গ্রন্থে।

গ্রন্থটিতে শুধুমাত্র আন্দোলন ভিত্তিক ইস্তাহার ও প্রাসঙ্গিক তথ্যটুকুই আছে। পাঠক লক্ষ্য করবেন, এই গ্রন্থভুক্ত সাহিত্য-আন্দোলনগুলির বাইরেও অন্য কবিতা বা অন্য গদ্যরীতির প্রয়াস সৃজনশীল। এই সৃজনশীলতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাংলা লিটল ম্যাগাজিনের উত্তাপ। কেউবা ব্যক্তিগতভাবে কবিতার ইস্তাহার রচনা করেছেন (মুক্ত কবিতার ইস্তাহার : শৈলেশ্বর ঘোষ)। কবিতার ভাষা নিয়ে বক্তব্য রেখেছে 'কবিতা ক্যাম্পাস' পত্রিকা। রইল হয়তো অনুক্ত এরকম অনেক কিছুই।

বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে গত তিন দশকের (৬-৭-৮ দশক) গল্প-কবিতার ১৯টি আন্দোলনের ইস্তাহারকে একত্রিত করে তুলে ধরা হলো এই গ্রন্থে। বইটির পরিশিষ্টে রইল গদ্য ও কবিতার কিছু নমুনা। কৌতূহলী পাঠক-জিজ্ঞাসায় অন্বিষ্ট মন হোক অনুসন্ধানী গবেষক।

এই গ্রন্থে বিমল করের 'ছোটগল্প : নতুন রীতি' দুষ্প্রাপ্য সংযোজন। 'বাতিঘর' পত্রিকার সম্পাদক কবি সিদ্ধার্থ সেনের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। ধন্যবাদ জানাই অমিয় ভট্টাচার্যকে যিনি এই গ্রন্থের প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন। ধন্যবাদ অরুণকুমার দে-কে যিনি হাসিমুখে আমার কাজকে ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করেছেন।

বিনীত—

সন্দীপ দত্ত

কবিতা-আন্দোলন

বাংলা কবিতার চর্চা আজ সম্প্রসারিত। এর শুরু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র কবিতার আন্দোলনে গতি দেওয়ার জন্য কবিতাচর্চার মাধ্যম হিসেবে প্রকাশ করেন বেশ কয়েকটি কবিতার পত্রিকা—কবিতা কুসুমাবলী (১৮৬০) চিত্তরঞ্জিকা (১৮৬২), অবকাশ-রঞ্জিকা (১৮৬২) কাব্যপ্রকাশ (১৮৬৪) ও পদ্য প্রকাশিকা (১৮৬৮)। বাংলা কবিতাচর্চার ইতিহাসে এইসব পত্রিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত আর পত্রিকাগুলি হলো বীণা (১৮৭৮), কৌমুদী (১৮৭৮), কিরণ (১৮৮৩) প্রভৃতি।

আধুনিক বাংলা কবিতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে 'কবিতা' পত্রিকার গুরুত্ব ঐতিহাসিক। কবি বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার প্রকাশ ১৩৪২ বঙ্গাব্দে (১৯৩৫)। ঠিক এর কিছুটা আগে 'পরিচয়' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে আর এক কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় (১৯৩১)। 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশ পেল কেবলই কবিতা নিয়ে। সমসাময়িক যে সমস্ত বাণিজ্যিক, আধা-বাণিজ্যিক বা অবাণিজ্যিক পত্রিকা প্রকাশ পেত, সেইসব পত্রিকায় কবিতার স্থান ছিল দায়সারা গোছের। উপন্যাস বা ছোটগল্পের কিংবা প্রবন্ধের পাদদেশে নিতান্তই তাচ্ছিল্যে অথবা 'বদান্যতায় প্রকাশ পেত কবিতাবয়ব। এই পাদপূরণমার্কা অবহেলা ও উপেক্ষার প্রতিবাদে, অনেকটা ইংরাজী 'POETRY' পত্রিকার অনুসরণে প্রকাশ পেল 'কবিতা'। বলা যায় 'কবিতা' পত্রিকা কে কেন্দ্র করেই প্রথম কবিতা আন্দোলন সংগঠিত হলো। সমসাময়িক প্রজন্মের কবিদের কবিতা, আলোচনা ও কবিতার বইয়ের সমালোচনা নিয়মিত প্রকাশ পেত সেখানে। বাংলা সাহিত্যে বিদেশী সাহিত্য ভাবনার সঙ্গে যথার্থ পরিচয় ঘটানোর দায়িত্ব নিয়েছিল 'পরিচয়'। তেমনি 'কবিতা' বিদেশী কাব্যভাবনার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল অন্য ভাষার কবিদের কবিতার অনুবাদ ও বিদেশী কবিদের সঙ্গে পরিচয়ের মধ্য দিয়ে। মার্কিন সংখ্যা, ইংলিশ সাপ্লিমেন্ট সংখ্যা, আন্তর্জাতিক সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।

'কবিতা পত্রিকা আলাদা করে কোনো ম্যানিফেস্টো প্রকাশ না করলেও

এই পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গির নিজস্বতা ছিল। তা প্রকাশ পেত সম্পাদকীয় মন্তব্যে।

১০ম বর্ষ ২য় সংখ্যায় বলা হয়েছে—'... রাজনীতির যে প্রেরণা ভাবলোকের, তা থেকে যে কবিতা রস আহরণ করেছে তাকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছি। কিন্তু যে রচনা শুধু সেকেলে গতানুগতিকতার বদলে এনেছে গতানুগতিকতার সমষ্টি, তাকে আমরা বর্জন করার দিকেই লক্ষ্য রেখেছি।...'

আন্তর্জাতিক ভাবে বাংলা কবিতাকে পৌছে দেওয়ার লক্ষ্য ছিল 'কবিতা'র। ২৪ বর্ষের ২য় সংখ্যায় (আন্তর্জাতিক সংখ্যা) সম্পাদক জানিয়েছেন: Our aim was to foreigners and that of rather notions to Indians, but let us make it clear that the linguistic distributions in this issue follows no defenite Plan'.

বানান সম্পর্কে 'কবিতা'র দৃষ্টিভঙ্গিতে নিজস্বতা ছিল। এখানে বলা হল—

কবিতার এই সংখ্যা থেকে আমরা বানানে একটি প্রয়োজনীয় নূতনত্বের প্রবর্তন করলাম: ইংরেজী Z ব্যঞ্জনের স্থলে 'জ' ও ফরাশি T বা রুশীয় Zh এর স্থলে 'জ' অক্ষর ব্যবহার করা হোল, ভবিষ্যতে তাই করা হবে। যাঁরা কবিতার জন্য রচনা পাঠাবেন তাঁরা পাণ্ডুলিপিতে এই বানান ব্যবহার করলে আমরা বাধিত হবো (১৪ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা)।

পরবর্তীকালে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত নিরুক্ত পত্রিকা (১৯৪০) আধুনিক বাংলা কবিতা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট অধ্যায়ের সূচনা করে। 'নিরুক্ত'তে শুধু তরুণ ও সমসাময়িক কবিদের কবিতাই থাকত না, প্রবীণ বয়োজ্যেষ্ঠ কবিদের কবিতাও প্রকাশ পেত। অনুবাদ, প্রবন্ধ, সমালোচনা প্রকাশ পেত সেখানে।

৫ এর দশক ॥

পত্রিকা: শতভিষা (১৯৫১) ও কৃত্তিবাস (১৯৫৩)। এরা ঠিক আন্দোলনমুখী কাগজ নয়। তারুণ্যের মেজাজ ছিল তাদের। 'কৃত্তিবাস' কখনো প্রবীণ কবিদের কবিতা ছাপেনি, ছেপেছে তরুণ, অতি তরুণের কবিতা। আত্মজৈবনিক স্বীকারোক্তির কবিতায় বিশ্বাস ছিল কৃত্তিবাসের।

৬ এর দশক ॥

৬৬-৬৭ নাগাদ কবিতার উন্মাদনায়, অদ্ভুত হুজুগেপনায় মাতে কবিতা

দৈনিক, কবিতা সাপ্তাহিকী, দৈনিক কবিতা, কবিতা ঘন্টিকী, কবিতা টেলিগ্রাফ, কবিতা পাক্ষিক, কবিতা মুহূর্ত, শতবার্ষিক কবিতা প্রভৃতি কাগজগুলি। বেশ কিছুদিন টিঁকে ছিল দৈনিক কবিতা ও কবিতা সাপ্তাহিকী।

৬ ও ৭-এর দশকে বাংলা লিটল ম্যাগাজিনের জোয়ার। একদিকে যেমন অসংখ্য কবিতার পত্রিকা প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি প্রকাশিত হয়েছে তরুণ কবিদের কবিতার বই।

ইস্তাহার বা ম্যানিফেস্টো এবং কবিতার নব্যভাবনা সামনে রেখে ৬, ৭ ও ৮ দশকের যে আন্দোলনগুলি কবিতার ক্ষেত্রে দেখা গেল তা হলো—

(১) হাংরি জেনারেশন (২) শ্রুতি (৩) ধ্বংসকালীন (৪) প্রকল্পনা (৫) আজকাল (৬) নিওলিট মুভ:মণ্ট (৭) থার্ড লিটারেচার (৮) মানভি আন্দোলন (৯) উত্তর-আধুনিক কবিতা।

১: হাংরি জেনারেশন

সূচনা: এপ্রিল ১৯৬২—বুলেটিন প্রকাশের মাধ্যমে। স্রষ্টা, নেতৃত্বে ও সম্পাদক:—যথাক্রমে মলয় রায়চৌধুরী, শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও দেবী রায় (১ম সংখ্যা—প্রচ্ছদ)।

পত্রিকার প্রকাশ স্থান: ৪৮এ শম্ভু হালদার লেন, আহিরীটোলা, কলকাতা-৫। পরে নানা পরিবর্তিত ঠিকানা।

এদের ইস্তাহার:

1. The merciless exoosure of the self in its entirety.
2. To present in all nakedness all aspects of the self and thing before it.
3. To catch a glimpse of the exploded self at a particular moment.
4. To challenge every value with a view to accepting or rejectinge the same.
5. To consider everything at the art to be nothing but a 'thing' with a view to tesing whether it is living or lisfeless.

6. Not to take reality as it is but to examine it in all its aspects.
7. To seek to find out a mode of communication, by abolishing the accepted modes of prose and poetry which would instantly establish a communication between the poet and his reader.
8. To use the same words in poery as are used in ordinary conversation.
9. To reveal the sound of the word, used in ordinary conversation, more sharply in the poem.
10. To break loose the traditional association of words and the coin unconventional and here-to-force unaccepted combination of words.
11. To reject traditional forms of poetry and allow poetry to take its original forms.
12 To admit without qualification that poetry is the ultimate religion of man.
13. To transmit dynamically the massage of the restless existance and the sense of disgust in a razor sharp language.
14. Personal ultimatum.

ইস্তাহারেই আন্দোলনের ভিত্তি ঘোষিত। এবং হাংরি কবিতার বিষয় ও আঙ্গিক সম্পর্কে সূত্রগুলি তত্ত্বাকারে পরিবেশিত। এদের ইচ্ছা সমস্ত রকম ভাবে কবিতাকে পাল্টে দেওয়া। জৈবিক, মানসিক বিতৃষ্ণা, সার্বিক যন্ত্রণার শরীরই কবিতা। ভাষা শব্দে কোন শুচিমার্গিতা থাকবে না, যতটা আক্রমণাত্মক করা যায় তাই হবে। আমার মুক্তি ও সৃষ্টির যন্ত্রণাই বড় কথা।

পূর্বোক্ত তিনজন ছাড়া এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন—সমীর রায়-চৌধুরী, শৈলেশ্বর ঘোষ, প্রদীপ চৌধুরী, সুবিমল বসাক, ফাল্গুনী রায়, অবনি বসু ত্রিদিব মিত্র, সুবোধ আচার্য। বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুভাষ ঘোষ সুবিমল বসাক প্রমুখেরা মূলত গদ্যই লিখেছেন।

জেল হয়েছিল হাংরি প্রবক্তা মলয় রায়চৌধুরীর—কবিতায় অশালীন ভাষা প্রয়োগের অপরাধে। আমেরিকার TIMES পত্রিকায় হাংরি জেনারেশান সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশ পেয়েছিল। হাংরি আন্দোলনই বাংলা সাহিত্যে প্রথম সংগঠিত আন্দোলন। প্রাতিষ্ঠানিকতা, গতানুগতিকতার ধ্বজা ভেঙে এরা সাহিত্যে নতুনভাবে চলতে চাইল ও মূল্যবোধে, জীবনজিজ্ঞাসায়, কবিতাভাবনায়, শব্দচয়নে সমস্ত রকম ছুঁৎমার্গিতা অস্বীকার করে বিদ্রোহ ঘোষণা করল।

সমধর্মী পত্রিকাগুলি : জেব্রা, জিরাফ, ক্ষুধার্ত, প্রতিদ্বন্দ্বী, Wastepaper রোবট ধৃতরাষ্ট্র, গেরিলা, কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প, ক্রমশঃ প্রভৃতি।

হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের সময়েই চলছিল ভারতীয় অর্থনীতি, রাজনীতির টাল-মাটাল অবস্থা—খাদ্যআন্দোলন, কমিউনিষ্ট পার্টির বিভাজন, চীনের ভারত আক্রমণ। সেই সময় হাংরির ভাবনা যৌনতামুখী, আত্মভাবনাগত—যেন এক পাশে মুখ ফিরিয়ে রইল। সত্যই কি এক পাশে মুখ ফিরিয়ে রইল? প্রাতিষ্ঠানিক স্থবিরতার বিরুদ্ধে জোরালো ধাক্কা দিল হাংরিরাই।

২ : শ্রুতি আন্দোলন

সূচনা : এপ্রিল ১৯৬৫, 'শ্রুতি' পত্রিকার প্রকাশে।

প্রবক্তা : পুষ্কর দাশগুপ্ত। ১ম সংখ্যার প্রকাশক: মৃণাল বসুচৌধুরী। সম্পাদক হিসেবে কারো নাম ছিল না। প্রকাশ স্থান : ৩৫-এফ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট কলকাতা-৫

১ম সংখ্যায় পুষ্কর দাশগুপ্ত শ্রুতি কবিতা সম্পর্কে জানিয়েছেন :—

'জৈব আর্তনাদ কিংবা সমাজচিন্তার স্থান যেখানেই হোক কবিতায় নয়'।

'কবিতার সার্থকতা বিচার করে পাঠকের মন'।

'কবির দিক থেকে উপলব্ধির প্রকাশকে সঞ্চারণক্ষম করে তোলার ক্ষমতা ও নৈপুণ্য প্রয়োজন।

'কবিকেও তাই শিক্ষিত হতে হয়। প্রথম শিক্ষা আত্মমগ্নতা দ্বিতীয় শিক্ষা প্রকাশের'।

'কবিকে পথনির্দেশ দেয় পূর্বজ কবিদের কাব্যকৃতি। আর বর্তমান কালে কবিতার আন্দোলন এবং চরিত্র পৃথিবীর কাছ ঐতিহ্যের মূল ধারণার সঙ্গে যুক্ত। তাই বিশ্বের সমস্ত মহান কবির উত্তরাধিকার আধুনিক কবির আয়ত্তে'।

'শ্রুতির' দ্বিতীয় সংখ্যায় ঐ একই আলোচনায় তিনি লিখেছেন :

'উপলব্ধির গভীরতাকে নব নব আত্মিক অভিজ্ঞতাকে ভাষায় যথার্থ প্রকাশ করতে না পারার অতৃপ্তি এবং সংশ্লিষ্ট ভাবেই ব্যবহৃত ভাষাপদ্ধতির জীর্ণতা সম্পর্কে অনুভব প্রত্যেক সচেতন কবির মনে সদাজাগ্রত।'

'মুদ্রণের উন্নত অবস্থায় কবি সম্ভাব্য উপায়ে এবং প্রয়োজন অনুসারে কবিতার বিন্যাসে দৃষ্টিগ্রাহ্য ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে পারেন'।

'...কবিতাপাঠের সময় পাঠকের চোখ এবং কান মিশে যায়। স্বভাবতই দৃষ্টিগ্রাহ্য বিন্যাস পাঠক শুধু চোখেই দেখেন না, কানেও শোনেন।'

'শ্রুতি'র কবিতা চর্চায় দৃষ্টি ও ধ্বনি নির্ভর আন্দোলনের সূত্রগুলি উপর্যুক্ত বক্তব্যে প্রকাশিত।

'শ্রুতি'র ইস্তাহার বা আন্দোলনের সূত্রগুলিকে ৩টি সংখ্যায় প্রকাশ হতে দেখি। এখানে সূত্রগুলি দেওয়া হলো :

'শ্রুতি, জুলাই ১৯৬৩

১) কোনো রকম ব্যাখ্যা, বিধান বা তত্ত্ব প্রচারের দায়িত্ব কবিতার নেই।

২) চিৎকার বা বিবৃতি এর কোনোটাই কবিতা নয়। রাজনীতি, প্রচারিত সামাজিকতা বা ক্ষুৎকাতর যৌনকাতর জৈবমত্ততার স্থান আর যেখানেই থাকুক কবিতায় নেই।

৩) ব্যক্তির কল্পনায় আন্তরিক অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধির প্রকাশে ব্যক্তিত্বের পরিমণ্ডল রচনাই কবিতা। তাই কবিতা হবে—ব্যক্তিগত মগ্ন এবং একান্তই অন্তর্মুখী।

৪) এ ছাড়া কবিতায় কোন একমুখী বক্তব্য বা একটিমাত্র বিষয় থাকে না, থাকে বহু অনুভবের মিলনে জটিল উপলব্ধির আবহ।

৫) ব্যক্তিগত বিষয়ের জন্য দরকার ব্যক্তিগত রচনারীতির আর রচনা পদ্ধতি এবং রচনার বিষয় অবিচ্ছেদ্যতাই বিবৃতিধর্মী জীর্ণ প্রকাশ পদ্ধতি ত্যাগ করে সব সময়ই উপযুক্ত প্রকাশ-রীতি খুঁজতে হবে, যার মাধ্যমে রচনা করা যায় ব্যক্তিত্বের সেই রহস্যময় পরিমণ্ডল, যাতে থাকে দৃশ্য-শব্দ-স্বাদ-স্পর্শের ব্যাখ্যাতীত সমন্বয়।

৬) সবশেষে বলা দরকার যে চরিত্রের স্থবিরতার চেয়ে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনশীলতাই আমাদের লক্ষ্য।

শ্রুতি, জানুয়ারি, ১৯৬৮ :

১) ভেঙে ফেলতে হবে সমস্ত প্রকার শাসন, ছিন্ন করতে হবে সংস্কারের সমস্ত বন্ধন। শব্দকে ব্যবহৃত বাক্যবন্ধের আবর্জনা থেকে এক এক করে বেছে নিতে হবে। তৈরী করতে হবে ব্যক্তিগত এবং অন্যান্য এক প্রচলযুক্ত বাক্‌রীতি।

২) ইতিপূর্বের সমস্ত শিল্পতাত্ত্বিক মতবাদই আমাদের কাছে মূল্যহীন।

৩) কবিতা চিৎকার নয়, নিবিষ্ট উচ্চারণ। কবিতা কারিগরী নির্মাণ নয়, শিল্পসৃষ্টি। কবিতা বক্তৃতা বা প্রচার নয়, নিবিড় অভিজ্ঞতা। কবিতা বুদ্ধির চমক নয়, ব্যাকুল সন্ন্যাস।

৪) আমরা বিশ্বাস করি কবিতা হয়ে ওঠা ছাড়া কবিতার আর কোন চেষ্টা বা উদ্দেশ্য নেই। কোন বাণী, বিধান বা নীতি প্রচারের দায়িত্ব কবিতার নয়।

৫) কবিতার একমাত্র অবলম্বন কবি / ব্যক্তির বিশেষ মানসিকতা এবং আন্তরিক অভিজ্ঞতা।

৬) রচনাপদ্ধতি এবং রচনার বিষয় আলাদা কোন ব্যাপার নয়। ব্যক্তিগত জগৎসৃষ্টির জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিগত উচ্চারণ রীতি।

শ্রুতি, মার্চ ১৯৬৯ ॥

১) নতুন ধরনের মুদ্রণবিন্যাসের সাহচর্যে কবিতার দৃষ্টিগ্রাহ্য অনুষঙ্গ সৃষ্টি।

২) ছেদচিহ্নের বিলোপ। প্রয়োজন মত স্পেস ও বিশেষ পংক্তি বিন্যাসের মাধ্যমে কোথায় থেমে পড়তে হবে তার নির্দেশ। কবিতার ভাষার মুখের কথার স্বাভাবিক ব্যঞ্জনাসৃষ্টি।

৩) অনুভবের অবলম্বন বিশেষ শব্দের গুরুত্ব অনুসারে তাকে অন্য শব্দের সঙ্গে জুড়ে বা বেশি স্পেস দিয়ে একেবারে আলাদা করে দেখানো। অথবা বিশেষ কোন শব্দকে সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হরফ থেকে আলাদা হরফে ছাপিয়ে তার প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ। কখনো বা শব্দের প্রতিটি বর্ণকে স্পেসের সাহায্যে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে গানের লয়ের মতো উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য তৈরী করা। সমস্ত মিলিয়ে কবির অনুভবের ক্রমভেদে উচ্চারণের ওঠা-নামা নির্দেশ দেওয়া।

৪) ব্যাকরণের বিরোধিতা। ভাষা ব্যবহারে বাক্য প্রকরণের যুক্তি নির্ভরতার বর্জন। শব্দকে বাক্যের অংশ বা পদ হিসেবে না ভেবে প্রতিটি শব্দকে একক গুরুত্বে ব্যবহার করা। সংযোজক অব্যয়, ক্রিয়া বি'শষণ, বিশেষণ-ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় ভারসৃষ্টিকারী শব্দকে যথাসম্ভব পরিহার করা।

৫) প্রচলিত ছন্দকে বর্জন করে বা ভেঙে কবিতার ভাষায় ব্যক্তিগত উচ্চারণের স্বতন্ত্র স্পন্দন সৃষ্টি।

এঁদের এই ইস্তাহারগুলির মধ্যেই শ্রুতি-কবিতাচর্চা আন্দোলন প্রকাশিত। মোট ১৪টি সংখ্যা এদের প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬৫ থেকে ১৯৭১-এর মধ্যে। এঁদের কবিগোষ্ঠির মধ্যে রয়েছেন, পুষ্কর দাশগুপ্ত, মৃণাল বসুচৌধুরী, পরেশ মণ্ডল, অনন্ত দাশ, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার ঘোষ, তপনলাল ধর, অতীন্দ্রিয় পাঠক, অশোক চট্টোপাধ্যায়, রথীন ভৌমিক প্রমুখ।

এঁরা সমাজচেতনা ও সমকালীন রাজনীতিকে পরিহার করেছেন। শব্দচর্চা ও ব্যক্তি অনুভবকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

সমধর্মী পত্রপত্রিকা : জৈগল, শাস্ত্র বিরোধী (সাহিত্য) অব্যয় ও কালক্রম।

৩। ধ্বংসকালীন কবিতা আন্দোলন :

১৯৬৬ সালে 'সাম্প্রতিক' পত্রিকার মাধ্যমে এর সূত্রপাত। আন্দোলনে যুক্ত অন্যান্য কাগজ—কবিপত্র, বক্তার, কবিতা সাম্প্রতিক, অধুনা সাহিত্য দৃশ্যপট। সুকোমল রায়চৌধুরী, প্রভাত চৌধুরী, অঞ্জন কর, কাননকুমার ভৌমিক, দীপেন রায়, শিবেন চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ আন্দোলন শুরু করেছিলেন গতানুগতিক কবিতাচর্চার বিরুদ্ধে। যুগ ও সমাজ চেতনায় আত্মবিশ্লেষণাত্মক শিল্প-সাহিত্যচর্চারই অন্য নাম ধ্বংসকালীন কবিতা আন্দোলন।

ধ্বংসকালীন কবিতার প্রস্তাবনা :

১) কবিতা শুধু সংগতিহীন চিত্রচিত্রণ নয়, আবার বাগ্মীতার শিরোচ্ছেদ চাই। প্রকৃতির মতো উদার আর অকৃত্রিম হবে কবিতা, ভালো হবে, মন্দ হবে, প্রচলিত কোনো আদর্শই কবিতার বাধা হতে পারবে না।

২) জীবন ও জীবন সম্বন্ধে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাজনিত উপলব্ধির নামই শিল্প, নাম কবিতা।

৩) কবিতাই কবির জীবনদর্শন যা না থাকলে অযৌক্তিক হাস্যকর বাক্যগঠন শিল্প পদবাচ্য হতে পারে না।

৪) সমস্ত অতীত ঐতিহ্য মন্থন করে নতুন বোধে উত্তরণই আমাদের লক্ষ্য, ছিন্নমূল প্রলাপ ভাষণের নাবালক ভূমিকা শিল্পীর নয় বলেই আমরা মনে করি।

৫) আমরা যা তাই আমাদের কবিতা। আমরা যা নই তা আমাদের কবিতায় নেই। অকৃত্রিমতাই আমাদের উপাস্য।

৬) মানবসভ্যতার ক্রান্তিমুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রজ্ঞাময় উপলব্ধির মহৎ উচ্চারণই ধ্বংসকালীন কবিতা।

ধ্বংসকালীন আন্দোলন সম্পর্কে 'সাম্প্রতিক' পত্রিকার দশম সংকলনে আর একটি ইস্তাহারে ঘোষিত হয়েছে :

১) জীবন ও জীবন সম্বন্ধে স্পষ্ট বা আপাত অস্পষ্ট ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জনিত উপলব্ধির নামই শিল্প, ধ্বংসকালীন সময়চেতনায় উত্তীর্ণ বোধ-সঞ্জাত মন্ত্র।

২) সমস্ত অতীত ঐতিহ্য মন্থন ক'রে নতুনতর বোধে উত্তরণই আমাদের লক্ষ্য, ছিন্নমূল প্রলাপ ভাষণের নাবালক ভূমিকা শিল্পীর নয় বলেই আমরা মনে করি।

৩) অস্তিত্ব বা অপর অর্থে জীবনানুসন্ধানের জন্যই শিল্পীর প্রকৃত অর্থে বেঁচে থাকা।

৪) অকৃত্রিমতাই আমাদের উপাস্য।

৫) গতিশীল পৃথিবীর যাবতীয় পার্থিব অপার্থিব বস্তুসংঘাতে আমাদের পটভূমিকা, অর্থাৎ শিল্পের সংজ্ঞায় অখণ্ড সময়প্রবাহের ঊর্ধ্বে উঠেও আমরা সময়ের কাছে নতজানু।

৬) মানব সভ্যতার ক্রান্তি মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রজ্ঞাময় আত্ম-বোধের স্বনির্ভর উচ্চারণে আমরা বিশ্বাসী।

৭) এবং ধ্বংসকালীন সেই অর্থে সৃষ্টিকালীন

৬এর দশকের রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ছিল অবশ্যম্ভাবী। স্থিতাবস্থা ও প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে প্রবল

প্রতিবাদ ঘোষিত হলো। ধ্বংসকালীন আন্দোলন সূচিত হয়েছিল এইভাবে। প্রচলিত গতানুগতিক বিকৃত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক মনোভাব জেগে উঠেছিল। ধ্বংসকালীন বা অ্যানিলিস্ট আন্দোলনের ইতিবাচক দিক এটাই।

এঁদের কবিতা আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন, কাননকুমার ভৌমিক, সুকোমল রায়চৌধুরী, অঞ্জন কর, প্রভাত চৌধুরী, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শিবেন চট্টোপাধ্যায়, দীপেন রায়, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, শংকর রায়, হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়, রবীন সুর প্রমুখ।

৪। প্রকল্পনা সর্বাংগীন কবিতা আন্দোলন :

এই আন্দোলন—কবিতার আঙ্গিকগত একটি আন্দোলন ১৯৬৯-এ শুরু। সূত্রপাত : 'স্বতোৎসার', ও 'কবিসেনা' প্রভৃতি পত্রিকার মধ্য দিয়ে ভট্টাচার্য চন্দন, এর প্রধান প্রবক্তা, ও প্রবর্তক। 'স্বতোৎসার পত্রিকার' অবয়ব ছিল হাতুড়ির মতো। অর্থাৎ প্রথাসর্বস্বতার বিরুদ্ধে জেহাদ। প্রকাশ স্থান : পি ৪০ নন্দনা পার্ক, কলকাতা-৭০০০৩৪

ইস্তাহার

অটোমেটিক রাইটারদের স্বতোৎসারিত প্রকল্পনা :

এক) সাহিত্যে এযাবত প্রচলিত কোন নির্দিষ্ট ফর্মে বিশ্বাসী নই আমরা।

দুই) কবিতা, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, উপন্যাস ইত্যাদি সমস্ত গতানুগতিক রচনারীতি এবং প্রথার শৃঙ্খল থেকে রোদনার্ত সাহিত্যকে মুক্ত করতে চাই আমরা প্রকল্পনা আন্দোলনের মাধ্যমে।

তিন) আমাদের বিশ্বাস সাহিত্য স্বতোৎসারিত অনুভব ও চৈতন্য-প্রবাহের (stream of consciouness) যথার্থ রেকর্ড (Automatic writing)।

চার) পাঠকদের সঙ্গে রচনার সমগ্র এবং সম্পূর্ণ একাত্মতা সৃষ্টি (Involevment of the readers with the writing—total and complete) আমাদের অন্যতম লক্ষ্য।

পাঁচ) বিভিন্নতার ভিতর বিভিন্নতা (Diversity in Diversity)— একই রচনা বা দৃশ্যের প্রতি বিভিন্নজনের দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা।

ছয়) জীবন সম্পর্কে নির্মোহ দৃষ্টি Exploration of our outlook towards life as it is.

সাত) ঘটনা দৃশ্য বা অভিজ্ঞতার প্রতি আমাদের অনুভূতির অনাবৃত উন্মোচন।

আট। প্রচলিত বাক্-রীতির আমরা ঘোর বিরোধী। শব্দ, বাক্য বা বাক্যাংশ আমাদের ভাবনার এবং তাৎক্ষণিক অনুভূতি ও কবিতার (Instant Poetry) একান্ত বাহনমাত্র। আমাদের লক্ষ্য শব্দের সীমানা অতিক্রম।

নয়) জীবন সম্পর্কে কোন কথাই শেষ কথা নয়। বিশেষ কোন মন্তব্য বা দার্শনিকে আঁকড়ে থাকা আমাদের কাছে হাস্যকর।

দশ) সাহিত্য কি উত্তরণের পথ নির্দেশ করে? জীবনের আবিষ্কৃত ও বিশ্বাস্য সত্য উদ্ঘাটনের মধ্যেই উত্তরণের যথার্থ অর্থ নিহিত বলে আমরা মনে করি।

১৯৬৯ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ভট্টাচার্য চন্দন, দিলীপ গুপ্ত ও শুক্লা মজুমদার এই ইস্তাহারটি ঘোষণা করেন।

স্বতোৎসার-এর এর অন্য একটি সংখ্যায় (৫ম বর্ষ ১৩ সংখ্যা ১৯৭২) আছে : —

চেতনাভ্যাসবাদী প্রকল্পনা গোষ্ঠীর প্রকল্পনা আন্দোলনের ইস্তাহার :

১ আমাদের সৃষ্ট ফর্ম প্রকল্পনা—>

সত্তার সামগ্রিক উন্মোচন যদি ১টি লেখায় কর্তে হয় তবে প্রচলিত কোনো ১টি আংগিকে তা সম্ভব নয় / সমস্ত আংগিক থেকে প্রয়োজনীয় প্রকাশভংগী আহরণ কর্তে হবে (অর্থাৎ এক একটি সময়ে একটি রচনার ১টি অংশ যে ফর্মের সাহায্যে লিখলে সবচেয়ে ভালোভাবে প্রকাশ করা যায়—>সেই আহরণই প্রকল্পনা—প্রবন্ধের 'প্র' কবিতার 'ক' গল্পে : 'ল্প' নাটকের 'না'—>সাহিত্যে আমাদের সৃষ্ট নবতম বেপরোয়া ফর্ম

২ আমাদের আবিষ্কৃত দর্শন চেতনাভ্যাস—>

প্রচলিত ধারণার বিপক্ষে আমাদেরি প্রাপ্ত বিশ্বাস যে মানুষের

সামগ্রিক জগৎ সম্পূর্ণভাবে তার সচেতনতার উপর নির্ভরশীল নয়/ জন্মবার পরই জীবশিশু আক্ষরিক অর্থে হলেও প্রকৃত অর্থে সচেতন হয়ে ওঠে না/ তার অবস্থান গত সমাজ পারিপার্শিক অবস্থা এবং নিজস্ব জৈবিক গঠন তাকে করে তোলে ক্রমশ সচেতন—যা ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে প্রাত্যহিক ব্যবহারের ফলে শুধু মাত্র চেতনার স্তরে থাকে না/ বারবার ক্রিয়াশীল অভ্যাসের দ্বারা তা হয়ে ওঠে চেতনা-ভ্যাস=চেতনা + ব্যবহারিক অভ্যাস যা চেতনায় দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রত নয়—> যা সম্প্রসারণশীল।

৩ আমাদের এ্যান্টি পত্রিকা স্বর্তোৎসার—কি অর্থে? স্বতোৎসার বলতে আমরা বোঝাতে চাই অনারোপিত রচনার শিল্পসম্মত রূপ (অবশ্যই প্রথাগত অর্থে নয়)

৪ স্বতোৎসার এ্যান্টিপত্রিকা—কি অর্থে?
স্বত্যেৎসার আকৃতিতে কুঠার ফলকের প্রতীকে গতানুগতিকার মূলে কুঠারাঘাত হানে, আর প্রকৃতিতে ফর্মের দিকে সাহিত্যের নবতম প্রকল্পনা এবং তত্ত্বের দিকে নবতম তত্ত্ব চেতনাভ্যাসবাদের আবিষ্কারের দ্বারা প্রচলিত পত্রিকার গতানুগতিক ধারণার বাস্তুভিটের ঘুঘু চরায় আমাদের বর্ণপরিচয়+দৃষ্টি পরিচয় :—>

৫ গতানুগতিক রচনারীতি এবং প্রথার শৃংখল থেকে রোদনার্ত সাহিত্য-কে মুক্ত কর্তে চাই আমরা/প্রচলিত বাকরীতির আমরা ঘোর বিরোধী/ শব্দ বাক্য বা বাক্যংশ আমাদের অনুভূতি ও ভাবনার একান্ত বাহনমাত্র/আমাদের লক্ষ্য শব্দের সীমানা অতিক্রম

৬ সপ্রাণ বা নিষ্প্রাণ সবকিছুরই মূল্য আছে, এ মূল্য আপেক্ষিক, নির্দিষ্ট এবং সমগ্রতায় পরিমাপযোগ্য নয়

৭ বাঁচার তাগিদে প্রতিটি মানুষের একের অন্যের স্বার্থে অমিল, নিজস্ব অনুসন্ধান আছে

৮ মূলগত সত্যের প্রকৃত+যথার্থ স্বরূপ উদ্ঘাটনের স্বার্থে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের যাচাই+পরিশোধনের দ্বারাই ব্যক্তি বস্তু ক্রিয়া ভাবনা-ইত্যাকার সবকিছুর পূর্ণমূল্যায়ণ প্রয়োজন

৯ চেতনাভ্যাসবাদে অবিচল থেকে প্রকল্পনা গোষ্ঠীর লেখকদের স্বকীয়তা রক্ষার জন্যে বিভিন্নতার মধ্যে বিভিন্নতা

১০ জীবন সম্পর্কে কোনো কথাই শেষ কথা নয়।

এঁদের 'স্বতোৎসার' ছাড়া আর একটি পত্রিকা আছে, 'কবিসেনা'। শেষোক্ত পত্রিকাটি বর্তমানে প্রকাশ হয়ে থাকে। এই পত্রিকায় 'সংখ্যা' শব্দের বদলে 'বিস্ফোরণ' শব্দটি প্রযুক্ত।

এদের 'কবিসেনা' পত্রিকায় ভট্টাচার্য চন্দন, 'চেতনাভ্যাসবাদ' 'প্রকল্পনা' 'সর্বাংগীন কবিতা' 'স্বচ্ছন্দ' সম্পর্কে যে সূত্র দিয়েছেন তা হলো :

[] চেতনাভ্যাসবাদ—সর্বাঙ্গীন চেতনা চিন্তাভাবনা প্রকল্পনাময় মনোজগৎ+বস্তুতঃ স্বভাব ও অভ্যাসের পৌর্নঃপুনিক নিত্য কর্মজগত।

[] প্রকল্পনা—প্রবন্ধের 'প্র'+কবিতা ও সংস্কৃতির 'ক'+গল্প ও শিল্পের 'ল্প'+নাটক উপন্যাস গান, সিনেমা, সর্বাঙ্গীন ও চেতনাভ্যাস 'না'—প্রকৃষ্টরূপে কল্পনা

[] সর্বাংগীন কবিতা—চেতনাভ্যাস সঞ্জাত স্বচ্ছন্দে চারুকার্য বিসতত্ত্ব পৌনঃপুনিক শব্দাক্ত+দৃশ্যাক্ত+ধ্বন্যাত্মক+সাংগীতিক উপলব্ধিমাত্র প্রকল্পিত কবিতা।

[] স্বচ্ছন্দ—স্বভাবী মিল+অমিল পদ্য+গদ্য ছন্দের প্রমিলনে সর্বাংগীন ছন্দ।

সর্বাংগীন কবিতা আন্দোলনের বয়স ২৩ বছর। এদের কবিতা গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ও আছেন, ভট্টাচার্য চন্দন, দিলীপ গুপ্ত, শুক্লা মজুমদার, উত্তর বসু, তপন ঘোষ, বাবলু রায়চৌধুরী।

আন্দোলনের ব্যাপকতাকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় বর্তমানে প্রকাশিত হয়ে থাকে 'প্রকল্পনা সাহিত্য' দ্বিভাষিক পত্রিকাটি। বর্তমানে অনিয়মিত।

৫. আজকাল কবিতা আন্দোলন

৭ দশকের গোড়ায় নৈহাটির তরুণ কবিরা 'আজকাল' পত্রিকার মাধ্যমে নতুন কবিতার অন্বেষণে ব্রতী হন। যদিও গল্প প্রকাশ পেয়েছে পত্রিকাটিতে তবে কবিতা প্রধান পত্রিকাটি। প্রকাশ পেত দেউলপাড়া, নৈহাটি ২৪ পরগণা থেকে। বর্তমানে পত্রিকাটির নাম 'আজকাল টাইটোনিভি' প্রকাশ

পায় ৭ বিজয়নগর নৈহাটি থেকে। বর্তমানে পত্রিকাটি অনিয়মিত। বাণী সমাদ্দার আলোক সোম ও বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী আজকাল কবিতা আন্দোলনের প্রবক্তা ও লেখক। বিভিন্ন সময় 'আজকাল' পত্রিকায় নতুন কবিতা ভাবনা সম্পর্কে এঁরা ভাবনা প্রকাশ করেছেন। এইসমস্ত নিবন্ধ থেকে কবিতার ভাবনা সম্পর্কে জানা যেতে পারে। এঁরা ঠিক ইস্তাহার লিখে কবিতা আন্দোলন করেন নি বরং পূর্বসূরীদের কবিতার ঐতিহ্যকে তীক্ষ্ণভাবে বিশ্লেষণ করে এবং বর্তমানকালে যে কবিতা লেখা চলছে তার সমীক্ষার মধ্য দিয়ে সঠিক কবিতার সিদ্ধান্তে আসতে চেয়েছেন।

আলোক সোম 'দেশজ জিওফিজিক্যালিটি' নিবন্ধে (আজকাল, সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ১৯৭৬) বলেন, 'কবিতায় চৈতন্যের প্রতিটি মুহূর্তের মুক্তি মুখর হয়ে ওঠে, একটা মানুষের মধ্যে অনেক মানুষের সংযোজন, এক দুঃখ থেকে আর এক দুঃখে শুধু উত্তরণ ঘটে যায় মানুষের, জীবনযাপনে কোথাও কখনো, বিস্ময়বোধ সীমিত হয়; এক বিশাল কমপ্লেক্স হাঁ করে গিলতে থাকে আমাদের স্বপ সম্ভ্রম, থাকে শিল্পসাহিত্য নান্দনিক কমপ্লেক্স বলতে পারি। এই অবস্থায় রচনাকর্ম বুঝে নেওয়া শুরু, পরস্পর একেকটা পর্যায় ভাগ নির্দিষ্ট হয়; অনুভবে, প্রজ্ঞায় বিশেষ ভাবে বিশ্লিষ্ট হতে থাকেন রচনাকার এবং কবিতা।'

গতানুগতিক পুনরাবৃত্তির কবিতায় ক্লান্ত আজকাল গোষ্ঠীর অক্টোবর ১৯৭৮ সংখ্যায় 'আত্মপক্ষ' শিরোনামে সম্পাদকীয় মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য : বাংলা কবিতার গৌরবময় অতীতকে নিরুপায় অবলম্বন ভেবে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বচ্ছ আলোকে ততবেশি নয়, এমন কি মূল সুরটিকে অক্ষুন্ন রেখে, সমকালে এক গরিষ্ঠ সংখ্যক কবি, নিবেদনের ভঙ্গিতে নিবিষ্ট রাখছেন তাদের কাব্যসাধনা। আশ্চর্য না হ'য়ে পারি না, ভাবলে বিমর্ষ হই, বাঙালি মানসতার পক্ষে পুষ্টিকর ও পরিচিত কবিতার-এই প্রধান ধারাটিকে, একমাত্র আশ্রয়ের ও বেড়ে ওঠার মন্ত্র হিশেবে ব্যবহার করে সমস্ত অতীতকে অতিক্রমের ইচ্ছা আমরা হারিয়ে ফেলছি। আমাদের সময়ের পক্ষে যা কিছু অনিবার্য গ্রহণীয় হ'য়ে উঠছে এবং ভবিষ্যকালের যা কিছু হ'তে পারত তা অতীত অভিজ্ঞতায় মিশে গিয়ে আর এক কবিতার ভবিষ্যতের কথা বলতে পারে। অথচ এসব হচ্ছে না। অন্তরের কোনো নির্দিষ্ট তাগিদ থেকে নয়, কোনো শিক্ষিত মন, অন্তর্জ্ঞান বা অনুভবের স্পষ্টতায় কবিতাকে ধরা নয়।

বরঞ্চ একঘেয়ে শব্দ ও অনুষঙ্গের ক্লান্তিকর পৌনঃপুনিকতায়, তাৎক্ষণিক প্রাপ্তির মুগ্ধতায় রচিত হচ্ছে অধিকাংশের কবিতা'…'কবিতা কবি নিজেই লেখে। দল বা মতের আদর্শ বা চিন্তা কবিতায় কখনই প্রতিবিম্বিত হয় না তবু, বিষয়ে ও চিন্তায় পরস্পরের থেকে উল্লেখ্য পার্থক্য থাকা সত্বেও, যদি, কখনও কোনো আপাত সাযুজ্য চোখে পড়ে কারুর, জানতে হবে বুঝতে হবে, তা আসলে মূল ধারাটিকে অন্তস্রোতে বইয়ে দেবার সমগ্রতা—একটা বড় ছবিকে অস্বীকার করার একতা। আমরা কমবেশী সংলগ্ন এখানেই।'

এই সম্পাদকীয়র উপসংহারে পরিষ্কার ভাবে 'দল' বা 'মত' এর আদর্শ বা চিন্তার কথা কবিতার ক্ষেত্রে অস্বীকার করা হয়েছে। বলা হয়েছে 'অন্তস্রোতে বইয়ে দেবার সমগ্রতা' এবং সেখানেই আজকাল কবি গোষ্ঠীর সমর্থন।

৬। **নিওলিট মুভমেণ্ট**

'টাইরেসিয়াস' পত্রিকার মাধ্যমে এর সূত্রপাত। ১ম সংখ্যায় (জুলাই ১৯৭৪) সাহিত্যে তথা কবিতায় জীবন ও চেতনায় সমগ্রতার কথা বলা হলো। সম্পাদকীয় বক্তব্যের ইস্তাহার প্রকাশ হলো :

'নিওলিট মুভমেণ্ট মনে করে, (১) কবিতায় নিজস্ব ব্যক্তিত্ব থাকা দরকার, যা উঁচু ও গভীর, যার কণ্ঠস্বর সহজেই পাঠকের সঙ্গে কথা বলতে পারবে।

(২) আমরা কবিতায় আপাত অভিজ্ঞতা ও ব্যবহারিক বাস্তবতার প্রবেশ বিশ্বাস করি না। আমাদের লক্ষ্যও চেতনায় সমগ্রতা। তাই প্রয়োজন লৌকিক ও দূরলৌকিক অর্থাৎ অন্যভাষায় বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের ভেদরেখা বা সীমারেখা মুছে দিয়ে উভয়ের সংমিশ্রনে দ্বান্দ্বিক ও বিস্তৃত বাস্তবতা। এর ফলেই সম্ভব ও সহায়ক হবে মানুষের জীবন ও চেতনার সাহসী ও ক্ষমতাশালী বিস্তার।

(৩) আমরা আরও মনে করি যে কোন মুহূর্ত বা সময়খণ্ডের এবং অসীম কালের বা সময়ের মধ্যে যে ভেদ বা সীমারেখা রয়েছে তা মুছে দিতে হবে। ঐ ক্ষুদ্র সময়খণ্ডের আধারে বিশাল সময়ের চেতনায় অস্তিত্ব ধরার প্রয়াসে কালগত সীমা ভেঙে যাবে।

(৪) বিমূর্ততার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত সুস্থ ও প্রাণবন্ত মূর্ততা ফুটিয়ে তুলতে হবে, যা সহজে ও গভীরভাবে ভাব ও ভাবনাকে উদ্দীপিত করবে, মাটি-মানুষ ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তার সঠিক অস্তিত্ব সম্পর্কে তাকে সচেতন করবে।

(৫) কবিতার গঠন আপাত-আলগা মনে হতে পারে, কিন্তু বিষয় আঙ্গিক অর্থাৎ শব্দচয়ন, ধ্বনি, ভাবনা ও উপস্থাপনা ইত্যাদি কোথাও একটা ঐক্য-তানে দৃঢ়সংবদ্ধ থাকবে এবং সব মিলিয়ে উঠে আসবে কবিতা।

(৬) কবিতার কোন পংক্তি কিম্বা কোন কোন শব্দ তার পুরনো অর্থ নিয়ে উপস্থিত না-ও হতে পারে, তার ফলে পাঠকের কাছে তা আপাতভাবে অর্থহীন মনে হতে পারে। কিন্তু ব্যাপক ও বিস্তৃত এবং গভীর বাস্তবতার সঠিক অর্থময়তা ও ব্যঞ্জনা থাকা দরকার।

এঁরা পূর্ববর্তী বিপ্লবিক পরিবর্তন হিসেবে 'কৃত্তিবাস' এঁর 'যৌবনের জোয়ার'কে স্বীকার করে সমসাময়িক জায়গায় রিক্ততা আবিষ্কার করেছেন। 'কৃত্তিবাস' এর মতো করে নয় নতুন ভাবে কবিতা লিখতে হবে। এরা মনে করিয়ে দিয়েছেন, সমকালীন কবিতার ভিত্তিভূমি 'আপাত অভিজ্ঞতা'। ফলে তা কখনোই জীবনের সমগ্রতা স্পর্শ করে না। এই সংকট ও অসম্পূর্ণতা দূর করা প্রয়োজন। তাই 'নিওলিট মুভমেণ্ট', একে তারা 'বিস্ফোরণ' বলে চিহ্নিত করেছেন। এঁদের ১বা ২টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। এরা শুধু কবিতার কথা বলেন নি, ছোটগল্প সম্পর্কেও ভাবনা ছিল। এরা স্পষ্ট লিখেছেন 'আন্দোলনের বহির্ভূত কবি ও লেখকদের লেখা ছাপতে পারছি না বলে দুঃখিত।' এবং এই আন্দোলনে শরিক হতে আহ্বান জানিয়েছেন।

পত্রিকায় সম্পাদক হিসেবে কারো নাম নেই। প্রকাশিকা অনামিকা দাস। প্রথম সংখ্যায় সুভাষ সাহার ৪টি কবিতা আছে। প্রকাশ স্থান : ১১ সি ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলকাতা-৩৭।

৭। থার্ড লিটারেচার আন্দোলন

মুখপত্র : 'কবিপত্র প্রকাশ' পবিত্র মুখোপাধ্যায় ও শৈবাল মিত্র সম্পাদিত। পূর্বনাম 'কবিপত্র'। জানুয়ারি মার্চ ১৯৮২ সংখ্যা থেকে, ২৫ বছরে পা দেওয়ার আগের মুহূর্তে কবিপত্র পত্রিকাটি এই আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করল। সাহিত্যে তৃতীয় ধারা বা স্রোত বিষয়টিকে এরা যুক্ত করলেন ইস্তাহারের মাধ্যমে। প্রকাশ স্থান : ২২বি, প্রতাপাদিত্য রোড কলকাতা-২৬।

থার্ড লিটারেচার : প্রয়োগবাদীকবিতা : ম্যানিফেস্টো

১। দৈনন্দিন বাস্তব অভিজ্ঞতার শিল্পরূপই কবিতা। ভাবাবেগ যথাসম্ভব বর্জনের চেষ্টা, যান্ত্রিকভাবে তত্ত্ব প্রয়োগের প্রবণতা ত্যাগ।

২) মার্কসীয় বস্তুবাদী দর্শন সম্বন্ধে স্পষ্ট বোধ ও সেই বোধের আলোকে জীবনকে দেখার বৈজ্ঞানিক প্রণালী থাকবে; সামাজিক সমস্যায় জড়িত কবি নিজের অভিজ্ঞ চোখকেই কাজে লাগাবেন যথাসম্ভব ব্যক্তিগত অহং বর্জন কোরে—

৩) পাঠকের সঙ্গে সহজ হৃদ্য সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য চলতি কালের ভাষার ব্যাপক ব্যবহার, কথাবলার ঢঙে বাক্য গঠন, কাব্যি করার প্রবণতা রোধ;— পাঠকের সঙ্গে সম্পর্ক ছলনার নয়, সহমর্মিতার সহযোদ্ধার, তা মনে রাখা—

৪) কবিতাও উদ্দেশ্যমূলক। কোনা অভিজ্ঞতা অনুভূতি পাঠকের সঙ্গে বিনিময়ের জন্য কবিতা; কবিরা গান করেন, পাঠক তা আড়ি পেতে শোনে—এ জাতীয় আত্মম্ভরিতা বর্জন—

৫) ছুঁৎমার্গী বিশুদ্ধবাদ বর্জন, জীবনের সঙ্গে জড়িত অনিবার্য তাবৎ কর্ম-কাণ্ডকেই কবিতার বিষয় রূপে গ্রহণ—

৬) কবিরা সমাজের বিবেক, প্রজাপতিব্রহ্মার সঙ্গে একাত্ম, বিশেষ সম্মানের অধিকারী, এ জাতীয় মনোভাব পরিত্যাগ; নিজেকে সাধারণ মানুষ হিসেবে দেখতে শেখা—

৭) লোকশিল্পের সহজ উপস্থাপনাকৌশল আয়ত্ত করা ও জীবনধর্মিতা—

৮) অতিরিক্ত সরলীকরণ বিরোধিতা; ব্যক্তিকবির স্বতন্ত্র চরিত্র রাখা, ব্যক্তিগত স্টাইল আবিষ্কার যা কর্মিষ্ঠ মানুষের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির স্বচ্ছন্দ উচ্চারণ, যান্ত্রিক তত্ত্বের শব্দসংস্থান নয়—

৯) অতিরিক্ত পাণ্ডিত্য, যা কবিকে ক্রমশ দূরে সরিয়ে রাখে তা বর্জন, কবি ও পাঠক একই ভূমিকায়, দুজন আলাদা নয় তা ভাবতে শেখা—

১০) শব্দের ব্যায়াম প্রদর্শন নয়, জীবনের চলমান কর্মকাণ্ডই কবিতা—

'কবিপত্র প্রকাশ' জুলাই ১৯৮২ সংখ্যায় ঘোষণা করা হলো আন্দোলন সম্পর্কে। পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক পবিত্র মুখোপাধ্যায় লিখলেন 'থার্ড লিটারেচার: কবিতা' নিবন্ধ। সেখানে কবিতার 'ধোঁয়াটে ভাবালুতা' বা 'অতীন্দ্রিয় দুষ্প্রবেশ্যতা' থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার কথা বলা হলো। প্রয়োগবাদী কবিতায় বিশ্বাস রেখে বলা হলো… 'আমাদের বিশ্বাস মার্কসবাদে, অতএব, আমাদের শিল্প বেশি বেশি ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠুক এটা কাম্য, কিন্তু অতি সরলীকরণ, যা মার্কসবাদী শিবিরে চলেছে তা, অর্থাৎ শিল্প প্রকরণকে বাদ দিয়ে তত্ত্বনির্ভরতা, তার বিরোধিতাও একই সঙ্গে করতে হবে।…উচ্চবিত্তের ড্রইংরুমের সেলফে বা মধ্যবিত্তের ভাবালুতায় কবিতা বদ্ধ ডোবার মত জমে থাকুক, এটা আমরা চাই না।'

এই আন্দোলনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলা হয়েছে—'থার্ড লিটারেচারে বিশ্বাসী লেখক মনে করেন, আমাদের কাজ হবে এই সাহিত্য-পাঠে আগ্রহী মানুষের কাছে নতুন সাহিত্য নিয়ে পৌছোনো। এমন ভাষা ব্যবহার করতে হবে, এমন স্টাইলে তা বলতে হবে, এবং বিষয় হিসেবে জীবনের দৈনন্দিন তরতাজা অভিজ্ঞতা উপলব্ধিকে ব্যবহার করতে হবে, যা মানুষের সাহিত্য তৃষ্ণা যেমন মেটাবে, তেমনি সচেতন কোরে তুলবে দেশ কাল পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে, একজন সচেতন সক্রিয় চিন্তাগ্রস্ত মানুষ কোরে তুলতে সাহায্য করবে।'

পাঠকের সঙ্গে একাত্মতা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে প্রয়োগবাদী কবিতায় তুলনা উপমা চিত্রকল্প অলংকার যত না থাকে ভালো, কবিতার গতি ত্বরান্বিত করতে পাঠকের সঙ্গে কবির সম্পর্ক গড়তে, কথা বলার অনাবরণ স্পষ্টতাকে আনতে হবে।

'কবিপত্র প্রকাশ', জুলাই ৮৩ সংখ্যা নিবেদিত হলো থার্ড লিটারেচার তাত্ত্বিক ও নান্দনিক ব্যাখ্যামূলক বিশেষ প্রবন্ধ সংখ্যা হিসেবে।

'থার্ড লিটারেচার : কবিতা প্রয়োগবাদ' প্রবন্ধে সম্পাদক পবিত্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : 'কবিতা কোনো দৈবতাড়িত অর্ধোন্মাদ মানুষের অতিলৌকিক মন্ত্র বা স্তব নয়, নেহাতই নানা টানাপোড়েনের মধ্যে জীবিত এক ব্যক্তিসত্তার সজ্ঞান অনুভব ও উপলব্ধির শব্দবদ্ধ শিল্পরূপ।'

বর্তমানে থার্ড লিটারেচার সংজ্ঞা সামনে রেখে বা থার্ড লিটারেচার আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে 'কবিপত্র প্রকাশ' পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে না।

৮। উত্তর-আধুনিক কবিতা

প্রবক্তা : অমিতাভ গুপ্ত, অঞ্জন সেন ও বীরেন্দ্র চক্রবর্তী। এঁরা ঠিক আন্দোলন হিসেবে বিষয়টিকে দেখতে চাননি। প্রস্তাবনা আকারে উত্তর আধুনিকতার বিশ্লেষণ করেছেন। আধুনিকতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এঁরা চিরকালিনতা-কে গুরুত্ব দিয়েছেন, গুরুত্ব দিয়েছেন, ঐতিহ্যময়তাকে। উত্তর আধুনিকতা একটি কালবাচক বিশেষণ নয়। ইংরাজী Post Modern আর উত্তর আধুনিক একই ব্যঞ্জনা নয়। এঁরা আধুনিকতাকে পেরিয়ে যেতে চাইছেন। অবক্ষয়ী আধুনিকতা এবং ঔপনিবেশিক আধুনিকতার বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করেছেন এঁরা। এঁদের মতে ৫০-এর উন্মাদনার কারণে ৩০-৪০ দশকের কবিদের মেধাবী ও সচেতন শিল্প প্রয়োগের প্রতি অনাদর দেখানো হয়েছে। তাকে নিরাকৃত না করতে পারলে উত্তর আধুনিক কবি চেতনার পটভূমি অসম্পূর্ণ থাকে। অবক্ষয়ী আধুনিকতার

বিরোধী এঁরা। ইউরোআমেরিকান যে অবক্ষয়ী আধুনিকতা তা বিকারগ্রস্ত। সৃষ্টি-ছাড়া বুদ্ধিভ্রষ্ট ব্যক্তিসত্তার দ্বারা পরিচালিত এই অবক্ষয়ী আধুনিকতা যা বাংলা কবিতা ভাবনাকে বিশৃঙ্খল করেছে। বুর্জোয়া মানবতাবাদের ভাবালুতার ও আধুনিক বিকৃত-যৌনতাবাদের বিরুদ্ধে উত্তর আধুনিকতাবাদ। দেশমাতৃকা বিরোধী নয়, দেশের মাটির কাছাকাছি বরং থাকতে চান এঁরা। সমসাময়িক সমাজের ভাবনাকে বাদ দিয়ে কবিতা হতে পারে না। শব্দ, ভাষা প্রয়োগ দুরূহ নয় সহজ ভাবে প্রযুক্ত হবে।

১৯৮৫ সালে বাংলা কবিতার আলোচনায় যুক্ত হয়েছে উত্তর আধুনিক কবিতা প্রসঙ্গটি। জনপদ, আলোচনা চক্র, সাম্প্রত, লালনক্ষত্র, গাঙ্গেয়পত্র ক্যাকটাস প্রভৃতি লিটল ম্যাগাজিনের বিভিন্ন সংখ্যায় এ বিষয়ে বেশ কিছু আলোচনা প্রকাশ পেয়েছে।

উত্তর আধুনিক কবিতাসূত্রের অন্যতম প্রবক্তা অঞ্জন সেন অবক্ষয়ের আধুনিকতা বনাম উত্তর আধুনিকতা (১৯৫০-১৯৮০) বিষয়ে একটি বিভেদী চিত্র এঁকেছেন। গৌতম বসু সম্পাদিত 'জনপদ' পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় ১৯৮৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'কবিতার চারপাশ/আধুনিকতা পেরিয়ে' প্রবন্ধের পরিশিষ্ট থেকে এটি নেওয়া হলো :

বাংলা কবিতা (১৯৫০-১৯৮০)

অবক্ষয়ের আধুনিকতা বনাম উত্তর-আধুনিকতা

৫০/৬০-র অবক্ষয়ীদের কবিতা	৭০/৮০-র উত্তর-আধুনিকদের কবিতা
১) মূলত রমাবাদী বা রোমান্টিক সেই সঙ্গে ইংরেজ/ফরাসী (১৮৯০-১৯০০) ও ইউরোপ আমেরিকার হাংরী, বিট, অ্যাংরি কবিদের সম্মেলন।	১) মূলত অরম্যবাদী।
২) পরাবাস্তববাদের কিছু উপাদান এঁদের কবিতায় পাওয়া যাবে—পরাবাস্তববাদী কল্পনা ও ভাব-প্রেরণা এঁদের হাতে যৌন কল্পনায় পরিণত হল—যৌন কল্পনাকে এঁরা বাস্তবায়িত	২) পরাবাস্তববাদীদের সঙ্গে মিল কেবল মাত্র এই যে পরাবাস্তব-বাদীদের মত এঁরাও বিশ্বাস করেন কবির নৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক দায়িত্ব আছে-কল্পনাকে

করতে চেয়েছেন—কবির নৈতিক সামাজিক দায়িত্ব, এঁরা অস্বীকার করেছেন।	বাস্তবায়িত করায় পরিবর্তে উত্তর-আধুনিক কবিতায় কল্পনা ও বাস্তবের দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়।
৩) অবক্ষয়ীদের কবিদের কবিতায় পাওয়া যাবে 'আর্তনাদ' ও 'কাতরতা'।	৩) উত্তর-আধুনিক কবিতা নীরব ও বস্তুমুখী।
৪) অবক্ষয়ীরা শারীরিক অনুভূতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।	৪) উত্তর-আধুনিকরা সামগ্রিক অনুভূতিকে প্রধান্য দিয়েছেন। বিশ্ব জগতের সঙ্গে সরাসরি আনুভূতিক সচেতন, ইতিবাচক সংযোগ স্থাপন উত্তর আধুনিক কবিতার লক্ষণ।
৫) রচনা সীমিত—একভাষী। সমাজ-সংস্কৃতি রাজনীতি ও ইতিহাসের ভিত্তি না থাকায় এঁদের কবিতায় আন্তরকৃতিক (বা আন্তরবাচনিক) ও আন্তরসাস্কৃতিক সম্পর্ক প্রায় অনুপস্থিত।	৫) উত্তর-আধুনিক কবিতা বহু-ভাবিক সমাজ সংস্কৃতি-ইতিহাস ও রাজনীতির সঙ্গে সংযোগে এঁদের কবিতায় আন্তরকৃতিক ও আন্তরসাংস্কৃতিক সম্পর্ক উপস্থিত।
৬) অবক্ষয়ীদের রচনায় গতানুগতিকতার ক্লান্তি, নৈরাজ্য ও নৈরাশ্য প্রবলভাবে লক্ষিত হয়।	৬) গতানুগতিকতার বাইরে যাওয়ায় চেষ্টা কবিতা সংশ্লেষাণত্মক ও বহু-মুখী উত্তর-আধুনিকদের বৈশিষ্ট্য।
৭) অবক্ষয়ীরা দেশ-ইতিহাস-সমাজ-সংস্কৃতি থেকে সাধারণত বিচ্ছিন্ন। বুর্জোয়া 'মুক্তি'তে বিশ্বাসী।	৭) দেশ ইতিহাস-সমাজ সংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত।
৮) অবক্ষয়ীদের কবিতার ভাষা গোষ্ঠী ভাষা ব্যক্তিভাষা অবক্ষয়ের আকরণে আকৃত।	৮) এরা কবিতায় গোষ্ঠী ভাষা ও ব্যক্তি ভাষাকে সচেতনভাবে আকৃত করেন।
৯) অবক্ষয়ীদের রচনা একরূপী।	৯) উত্তর-আধুনিকদের রচনা বহু অঙ্গাত্মক বা বহুরূপাত্মক।
১০) অবক্ষয়ীরা ব্যাকরণ-সম্মত পদ্যছন্দের পক্ষপাতী।	১০) উত্তর আধুনিকরা কথনের স্পন্দনের পক্ষপাতী।

১১) অবক্ষয়ীরা বিষয় ভাষা শৈলী নির্বাচনের পক্ষপাতী।

১২) অবক্ষয়ীদের কবিতা অতিকথনের পরিচায়ক।

১৩) অবক্ষয়ীদের সঙ্গে বহুজাতিক সংস্কৃতির যোগাযোগ।

১৪) অবক্ষয়ীদের কবিতায় বিশিষ্ট চিত্রকল্পের প্রাধান্য, দু'তিনটি শব্দের ওপর নির্ভরতা। বাগর্থ বা চিহ্নের স্তর অগভীর।

১১) উত্তর-আধুনিকরা সমস্ত কিছুর সমন্বয়ে বিশ্বাসী।

১২) উত্তর আধুনিকরা সংযমের পক্ষপাতী।

১৩) উত্তর-আধুনিকরা আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত।

১৪) উত্তর-আধুনিকদের কবিতা চিত্রকল্প বা দু'তিনটি শব্দ নির্ভর নয় 'সামগ্রিকতা' নির্ভর। বহু সংযোগের ফলে বাগর্থিক স্তর এবং চিহ্নের

উত্তর আধুনিকতা সম্পর্কে বিশদ জানার জন্যে পাঠককে অমিতাভ গুপ্তর ভূমিকাযুক্ত 'উত্তর আধুনিক কবিতা', 'উত্তর আধুনিক চেতনার ভূমিকা' বীরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত 'বাংলা কবিতার প্রাকৃতায়ন' গ্রন্থগুলি পাঠ করতে অনুরোধ জানাই।

৯। মালোভী কাব্য আন্দোলন

১৯৮৮ সালে, জানুয়ারী মাসে ১৪৬/এস, সি চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কোন্নগর, হুগলী থেকে মলয় আদক প্রকাশিত দ্বিমাসিক পত্রিকা 'অস্ত্রী' ঘোষণা করল কবিতা সম্পর্কিত একটি ইস্তাহার।

ইস্তাহার

ম্যাজিক্যাল ট্রিটমেণ্ট (মায়া)+ফোকলোর (লোক)+নির্ভীকতা (অভী) মুলতঃ এই তিনটি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে একটা সুবহ শব্দ গঠন করতে গিয়ে মায়া ও লোক শব্দের আদ্যক্ষর, এর সাথে অভীর অন্ত্যক্ষর যোগে মালোভী সঞ্জাত। যা একটা কাব্য আন্দোলনের নাম।

এখন কথা হচ্ছে কেন এই আন্দোলন? দীর্ঘদিন ধরে যখন স্থিতাবস্থা বা নিস্তরঙ্গতা রয়ে যায় তখন স্বভাবতই হাপিয়ে ওঠে মন। তাই মুক্তির আকাংখা জাগে মনে। আর এই স্থিতাবস্থাকে বাঁক নিতে গেলে দরকার হয় বিরুদ্ধাচরণের,

যা ফরাসী তথা ইউরোপের বিভিন্ন কাব্য আন্দোলনে পরম্পরায় মূর্ত, আমাদের দেশেও কমবেশী সেটা হয়েছে। তাছাড়া পরম্পরাগত ঐতিহ্যের বিবিধ ফাঁকগুলি অনুসন্ধিৎসু মনকে পীড়া দেয়। ফলে ঐ শূন্যস্থান পূরণ করতে গেলে দরকার হয় আন্দোলনের।

এই আন্দোলন করতে গিয়ে আমরা কিন্তু দাবী করছি না যে এটা কোন নতুন জিনিস যা টুপ করে আকাশ থেকে পড়ল। যুগের দাবী অনুযায়ী সম্ভাবনাময় অথচ বিচ্ছিন্ন বস্তুতান্ত্রিক ধারাগুলিকে সংযোজন ও গ্রহণ বর্জনের মধ্যে দিয়ে একটা সংহতি আনতে চাইছি।

অন্বেষা

১। আমরা এমন কবিতা লিখতে চাই না যা কেবলমাত্র কয়েকজন বুঝতে পারবেন বা বুঝতে পারার ভান করবেন। আমরা চাই কবিতা আরও বেশী বেশী মানুষের বোধগম্য হোক।

২) সমাজকে আলোড়িত করে যে সাময়িক এবং সুদূরপ্রসারী ঘটনাবলী তাদের তাৎপর্য উপলব্ধি করে সময় ও অনন্তের মাঝে স্থাপিত করতে চাই। ফলে যাবতীয় ঝুকি গ্রহণ করার স্পর্ধা থাকাটাও এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান শর্ত।

৩) কবিতার চাই ম্যাজিক্যাল ট্রিটমেণ্ট, তবে তা রহস্যময়তা সৃষ্টি করবে না। বরং উন্মোচনের সহায়ক। রহস্য দিয়ে রহস্যকে ধ্বংস করে গভীর ও পবিত্র অনুভূতির জন্ম দেওয়াই এই সম্মোহনের উদ্দেশ্য।

৪) সব কিছুর উৎসে যে লোকজীবন স্থিতাবস্থার সমর্থনের বিপরীতে তাকে বাঞ্ছিত করাই আমাদের অভিপ্রেত। সেই জন্যে চাই লৌকিক শব্দ ও মীথের প্রাণবন্ত ব্যবহার। তার মানে এটা মনে করার কোন কারণ নেই যে কবিতায় কতগুলি লৌকিক শব্দ ও মীথ রয়েছে তার উপর নির্ভর করবে সেই কবিতার উৎকর্ষ।

৫) প্রকৃতি ছন্দময়। জলপ্রপাত, সমুদ্র ও মেঘের গর্জনের বিপরীতে অরণ্যের সংগীতময়তা, বৃষ্টি পতনের শব্দ, পাখির কলতান, ভ্রমরের গুঞ্জন-এই কড়ি ও কোমলের অনুকম্পন চাই কবিতার শরীরে।

৬) প্রেম ও যৌনতার প্রতি কোন ছুতমার্গ নেই আমাদের বরং প্রেম ও যৌনতা যদি জীবনমুখী হয় তা সাদরে গৃহীত হবে। আমরা বিকারের বিরোধী, কাপুরুষতার বিরোধী।

৭) নাটকীয়তা কবিতাকে আবেদনগ্রাহ্য করে তোলে, তাই প্রয়োজন মত ক্লাইম্যাকস, অ্যান্টিক্লাইম্যাক্সের পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে।

৮) স্বত্বাব্যঞ্জক ছন্দের তীব্র অনুশীলন চাই গদ্য কবিতায়। পাশাপাশি প্রথাগত ছন্দ চর্চার দরজাও খোলা থাকবে।

এরা সম্পাদকীয়তে বললেন যে পুরনো ধারা পুরোপুরি বর্জন করা যেমন যায়নি তেমনি আত্মস্থ করা হয়নি নতুন প্রকরণে।—গোটা বিষয়ই পরীক্ষা নিরীক্ষার স্তরে রয়েছে। এঁরা আহ্বান জানিয়েছেন নতুন মুখের। এঁদের ৮টি সংখ্যা প্রকাশ পেয়েছে। এঁরা কবিতার বোধগম্যতাকে যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন তেমনি সমকালীনতার প্রতি দায়বদ্ধতার কথাও বলেছেন। গদ্য কবিতার পাশাপাশি প্রথানুগ ছন্দ চর্চাও করতে চেয়েছেন।

আন্দোলনকারী সদস্যগণ হলেন অমিত চক্রবর্তী একলব্য চট্টোপাধ্যায়, মলয় আদক, প্রবীর ভৌমিক, স্বপন চক্রবর্ত্তী ও জলধি হালদার।

গল্প আন্দোলন

বাংলা ছোটগল্পের বয়স এক শতাব্দী পার হয়ে এলো। গতানুগতিকতা থেকে, 'বর্ণনার ঘনঘটা' থেকে মুক্ত করে বাংলা ছোটগল্পকে সৃজনশীল করে তুললেন প্রথম রবীন্দ্রনাথই। 'হিতবাদী' (১৮৯১) পত্রিকার মাধ্যমে আমরা পেলাম বাংলা ছোটগল্পের প্রথম সার্থক গল্পস্রষ্টাকে। বিষয় বৈচিত্র্য, ভাষার ইঙ্গিতময়তা, উপস্থাপনা, প্লট নির্মাণে বাংলা ছোটগল্পকে অনন্য ক'রে তুললেন 'গল্পগুচ্ছ'র রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত বাংলা ছোটগল্পের ১০০ বছর বয়সে পালাবদল ঘটেছে অনেক—বিষয় ভাবনায়, উপস্থাপনায়, ভাষারীতিতে, গল্পবলায়, গল্পভাঙায়—নানা ভাবেই। বাংলা ছোটগল্পের এই পালাবদলের ইতিহাসে পত্রপত্রিকার গুরুত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাংলা ছোটগল্পের বিবর্তনে কল্লোল (১৯২৩) পত্রিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। 'কল্লোল'ই বাংলা ভাষায় শুধুমাত্র গল্পের প্রথম পত্রিকা। বৈশাখ ১৩৩০ বঙ্গাব্দের প্রথম সংখ্যা থেকেই 'কল্লোল' মাসিক গল্প সাহিত্য হিসেবে প্রকাশ পায়। বাস্তব ও সমাজচেতনা সমৃদ্ধ গল্পে ভরা 'কল্লোল'-এ পাওয়া গেল অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষ বস্তীর মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষকে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবোধকুমার সান্যাল প্রমুখ ছিলেন 'কল্লোল' এর নতুনধারার লেখক। ফ্রয়েডীয় যৌনদর্শনের পরিচয়ও পাওয়া গেল তাদের গল্পে; নিও রিয়েলিজম ধারার এই গল্পগুলি বাংলা গল্পে নিয়ে এলো বস্তুবাদী ভাবনা। দীনেশরঞ্জন দাশ ও গোকুল নাগ সম্পাদিত 'কল্লোল' পরবর্তীকালে কবিতার কাগজ হিসেবে প্রকাশ পেয়েছিল।

১৯২৯ সালে সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি'তে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬) প্রকাশ পেয়েছিল বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'নরকের কীট' গল্পটি। এই গল্পটির উল্লেখ বিশেষ ভাবেই করতে চাই। আজ থেকে ষাট-বাষট্টি বছর আগে প্রকাশিত এইগল্পটি গল্পভাঙার গল্প, গল্পহীনতার গল্প। অ্যান্টি স্টোরি ভাবনার অনেক আগেই অন্যভঙ্গিতে ঝকঝকে গদ্যে লিখিত এই তীক্ষ্ণ আয়রনি সমৃদ্ধ ব্যঙ্গাত্মক গল্পটি আজো আধুনিকতম।

৫-এর দশকের শেষভাগে ১৯৫৮-৫৯ সালে বিমল কর একটি ছোটগল্পের সিরিজ প্রকাশ করেন 'ছোগল্প : নূতন রীতি' শিরোনামে। প্রথম ৪ টি সংখ্যায়

সার কথা এই যে, এই গ্রন্থমালা বাংলা ছোট গল্প নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করার দুরূহ কাজটি পালন করার চেষ্টা করবে। এবং প্রবীণ অথবা নবীন যাঁদের এ-উৎসাহ ও ইচ্ছা আছে—কোনো পক্ষকেই অভ্যর্থনা করতে আমরা বিন্দুমাত্র ক্লেশ অনুভব করব না।

২) 'ছোট গল্প: নূতন রীতি' সম্পর্কে কিছু বলার আগে সম্ভবত ছোট গল্প কথাটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

ছোট গল্পকে ছোট এবং গল্প হতে হবে—এই চলতি ধারণার আমরা শরিক নই। সাহিত্যগত যে তত্ত্ব তাতে অবশ্য ছোট গল্পকে বলা হয়েছে, পাঠক যা এক দফায় (ইংরাজীতে যাকে বলেছে ইন্ ওআন সীটিং) পড়ে ফেলতে পারে। এই তত্ত্বের দোষ এই যে, কোনো পাঠক চার পাতার লেখা চার দফায় পড়েন, কেউ বা বিশ পাতার লেখা অক্লেশে এক দফায় (ওআন সীটিংয়ে) দিব্যি পড়তে পারেন। বস্তুত, এই তত্ত্বটি পাঠকের ধৈর্য পরীক্ষা করার কাজে লাগতে পারে। তাত্ত্বিকরা শব্দের হিসেব কষেও ছোট বড়র একটি সংজ্ঞা তৈরি করতে চেয়েছিলেন। যতদূর মনে হয় শব্দের হিসেবটা এই রকম ছিল: আড়াই হাজার শব্দথেকে দশ হাজার শব্দের মধ্যে যে-গল্প তাকেই ছোটগল্প বলা যায়। বলতে কি, এই তত্ত্বও অসার। ...বলাবাহুল্য, আমরা ছোট গল্পের 'ছোট' কথাটির নির্দিষ্ট কোনো অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে অপারগ। ফলে, মনে করি, কোনো লেখা সম্পর্কেই চূড়ান্ত কোনো তত্ত্ব সম্ভব নয়। কোনো শিল্পের ক্ষেত্রেই বাঁধা তত্ত্ব শিল্পীকে তার প্রার্থিত স্বর্গে পৌঁছে দেয় না। ছোট গল্পের ক্ষেত্রে, আমরা—এই গ্রন্থমালার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লেখকরা মনে করি, প্রচলিত তত্ত্বের প্রতি আমাদের আনুগত্য রাখার কারণ নেই, কেননা যে কোনো ধরনের লেখা হোক তার সম্পর্কে চূড়ান্ত কোনো তত্ত্ব থাকতে পারে না। সারোইয়ানের ভাষায় "The first requirement is a writer the second a reader. In between the theories can flourish for ever."

গল্প কথাটিরও প্রচলিত যে ব্যাখ্যা আমরা তার সমর্থন করি না। কিংবা বলা ভাল, বাহ্য ঘটনা পরম্পরা দিয়ে যে কাহিনী গ্রন্থন আমরা তাতে শিল্পময় গল্প বলতে কুণ্ঠিত। মানুষ মাত্রেরই গল্প শোনার লোভ প্রচুর—মাত্র এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে গিঁটে গিঁটে কৌতূহল উদ্রেক এবং রমণ চরিতার্থতার মতন এক সময় সমস্ত উত্তেজনার নিরসনকে যদি গল্প বলতে হয় তবে সাহিত্যে একমাত্র গোয়েন্দা গল্পেরই স্থান থাকা উচিত, অথবা ওই ধরনের গল্পের। বলতে লজ্জা নেই, বাংলা ছোট গল্পের যে ঐতিহ্য, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যে-ঐতিহ্যের গোড়া পত্তন করেছিলেন এবং

পরবর্তীকালে অনেক কুশলী লেখকের হাতে সেই স্রোতের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াস সত্ত্বেও অধিকাংশ বাঙালী পাঠকের গল্প পাঠের প্রত্যাশা অত্যন্ত স্থুল ধরনের। লেখকেরাও যেন পাঠকের এই চাহিদা পূরণকেই মেনে নিয়েছেন।...

পাঠকের মনে গল্পটির মারফত যে অনুভূতির সৃষ্টি হয় তা একক অনুভূতি—আমরা পূর্বে যাকে একটি মাত্র ভাবের সঞ্চরণ বলে উল্লেখ করেছি। কিন্তু ঈষৎ কৌতূহলী পাঠকও এবার লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য লেখককে কতক পথ বেঁধে নিতে হয়েছে। প্রথমত গল্পের স্বাভাবিক গঠনের প্রতি মনোযোগ, উপযুক্ত পটভূমিকা, পরিণতির পথে ক্রমগতি, পাঠকের কৌতূহল অথবা আগ্রহের বৃত্তিটিকে ক্রমোত্তর আকর্ষণীয় করে রাখা, একটি মাত্র বক্তব্য বিষয়কে পরিস্ফুট করা, বিবরণ ভঙ্গির ঐক্য, চরিত্র সৃষ্টি, লিখন রীতি, এবং একটি পরম সত্যের উন্মোচন।

গল্পের নিরেট কাঠামোকে আশ্রয় করে এই যে একটির পর একটি গুণ (কোয়ালিটি) যোগ করা, যাকে বলে রক্ত মাংস দিয়ে শেষাবধি প্রাণ সঞ্চার—এরই নাম শিল্পরূপ। সচেতন সজ্ঞান কুশলী না হলে এবং শিল্প কর্মে পটুত্ব না থাকলে এ-জিনিস হবার নয়।...

ছোট গল্পের সেই ধারা বহুদিন বয়ে এসেছে। আর উদ্যোগীর অভাবে কিংবা এক্সপ্লোরারের অভাবে ধারাটি মোটেই আর পরিচ্ছন্ন ছিল না, বদ্ধ হয়ে এসেছিল। পেশাদারী আর নকলনবিশ, প্রতিভাহীন আর মাঝারিদের হাতে পড়ে গল্প শেষ পর্যন্ত নিছক অধীর উদ্বেগ, চমক এবং স্টান্টের (Suspense, Surprise, Stunt) ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। হর্থন অথবা পো-এর মন্দটুকু নিয়ে কারবার ফেঁদে যাঁরা বাজার চালাচ্ছিলেন তাঁরা পাঠকের মনে এ-সংস্কার ততদিনে পুঁতে দিয়েছেন যে—ছোট গল্প মানেই সাসপেন্স, ছোট গল্পের চমৎকারিত্বের অর্থ চমক, কুশলতার অর্থ লেখকের ছলনা করার শক্তি।...

গল্প যতকাল নিছক গল্প ছিল ততকাল পাঠক ছিল শ্রোতা। গল্প যখন থেকে কাব্যের ঐশ্বর্য গ্রহণ করল, তখন থেকে পাঠক আর শ্রোতা থাকল না, লেখকের অভিজ্ঞতার সে সাথী হল, অর্থাৎ কৌতূহল মিটিয়ে সে তৃপ্তি পেল না, অন্যের অনুভূতি সবিস্তারে অনুভব করতে পারল। নিজের অভিজ্ঞতার অনুভূতির মতন।...

ভুল বোঝার অবকাশ দেব না বলে আরও একবার বলি, ছোট গল্পের সঙ্গে কবিতার বিবাহ দেবার এই চেষ্টা মূলত গল্পের হৃদয়কে শিল্পসম্মত শুভ্রতা দেবার অভিলাষ। যান্ত্রিকতা থেকে তাকে মুক্ত এবং উন্নত করার প্রচেষ্টা। উপরন্তু,

এ-যাবৎকাল একমাত্র কবিতা ছাড়া কোথাও লেখকের স্ব-চিন্তা ব্যক্তিত্ব ভাবনা আবেগ লেখায় খোলাখুলি প্রকাশ করা যেন নিষিদ্ধ ছিল। গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'সাবজেকটিভ' ভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবার পর এক ধরনের কাব্যময়তা স্বাভাবিক ভাবেই লেখায় এসে গেছে।…

আধুনিক জীবন আমরা সকলেই যাপন করি—যেহেতু এ-যুগে আমরা জন্মেছি। কিন্তু সব লেখকই আধুনিক নন—এ-যুগে জন্মানো সত্ত্বেও। আধুনিক লেখক তিনি যিনি তাঁর যুগের বিষয় সচেতন, তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেন। নতুন ধারণা বা ভাবনা, নতুন ভাবে জানা অভিজ্ঞতা পুরনো রীতির বোতলে ঢোকানো যায় না। আধুনিক কবিরা যেমন তাঁদের নতুন অভিজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে কাব্যের পূর্বরীতি ভেঙেছেন, তেমনি ঔপন্যাসিকরাও প্রচলিত রীতি না ভেঙে পারেন নি, এবং ছোট গল্পের লেখকরাও নতুন সুরা পুরনো বোতলে ভরতে রাজী নন।…

গল্প, ঘটনা, নাটকীয় মুহূর্ত, চরিত্র, সময়ের ঐক্য, ভাষার ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ব ধারণার সঙ্গে বর্তমান ধারণার অনেক গরমিল। নিশীথবাবু মারা গেলেন, কিছুকাল পরে তাঁর স্ত্রীও মারা গেলেন। একদা এই ঘটনার বিবৃতি গল্প বোঝাত। এখনকার দিনে সমালোচক বলবেন : নিশীথবাবু মারা গেলেন, তাঁর স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুতে শোকে অধীর থাকলেন কিছুকাল, ক্রমশ কেমন মুহ্যমান হয়ে থাকতেন, সংসারের দিকে টান বলে কিছু ছিল না, শোক তাঁকে ক্ষয় করছিল, একদিন তিনিও মারা গেলেন—এই হচ্ছে যথার্থ গল্প। ই, এম, ফরস্টার বলেছেন, আগেরটি স্টোরি, পরেরটি প্লট বা কাহিনী বিন্যাস। আমাদের বাংলায় গল্প ও কাহিনী বলতে কোনো তফাত বোঝায় কি না জানি না। তবে মনে হয়, খবরের কাগজের ঘটনার বিবরণকে আমরা যেমন খবর বলি, তেমনি একটি নিছক খবর ; অন্যটি বিস্তৃত, কারণসিদ্ধ, সুসঙ্গত, জীবন্ত বিবরণ বলেই বিন্যাস গুণ সমৃদ্ধ এবং সে কারণে গল্প।…এই রকম একাধিক বিষয়ে বর্তমান ধারণা পূর্ব ধারণার অনুবর্তী নয়। বর্তমানে তার আলোচনা করার অবকাশ নেই বলে পরবর্তী কোনো সংখ্যার জন্যে তুলে রাখলাম।

নাটক এবং কবিতার পর গল্প এখন আরেক রাজ্যের দিকে হাত বাড়াবার চেষ্টা করছে। সে-রাজ্য উপন্যাসের রাজ্য। আধুনিক উপন্যাসের চরিত্র-বদল যাঁদের চোখে পড়েছে, তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, এ-যুগে বাঁধা আঁটো-সাটো গল্প ঘটনার ঘনঘটা অবিস্মরণীয় চরিত্রসৃষ্টি ইত্যাদি আর উপন্যাসের পক্ষে একান্ত

অপরিহার্য বস্তু নয়। ঔপন্যাসিকের পক্ষে যে কোনো একটি অনুভূত সত্যকে কেন্দ্র করে সেই সত্য পরিস্ফুটনই সার কথা। পূর্বের তুলনায় ঔপন্যাসিক আজ তাই আরও তত্ত্ববাদী আত্মজিজ্ঞাসু এবং স্বগত।...

ছোটগল্পে নতুন দিগন্ত বোধ করি একেই বলে। তার মূল বা প্রাথমিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেড়শ বছর আগে যে সমুদ্র পাড়ি শুরু হয়েছিল, দেড়-শ বছর ধরে একটি মহাদেশ আবিষ্কারের পর আবার সে নতুন আর এক মহাদেশের কূলে নোঙর করেছে। শিল্পে—সব শিল্পেই—কোনো শাখাই নিঃশেষিত নয়, আমি স্বীকার করতে অপারগ যে, প্রতিটি শিল্প শাখাই এক একটি তুবড়ি, আগুন লাগার পর তার সব ফুল যথাসাধ্য আকাশে উঠে তারপর নিঃশেষ ছাই হয়ে গেছে। শিল্পে শেষ বলে কিছু নেই, যেমন নেই সভ্যতার মানুষের অগ্রগতির।'

ছোটগল্পের ভাষা-উপস্থাপনার নতুন রীতি আমরা পেলাম অমিয়ভূষণ মজুমদার, কমলকুমার মজুমদার, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, উদয়ন ঘোষ, অরূপরতন বসু থেকে সুবিমল মিশ্রর গদ্য কাঠামোয়। আরো অনেকেই পত্রিকাগোষ্ঠীর বাইরে থেকে স্বতন্ত্র ধারায় গল্প লিখেছেন।

৬, ৭, ও ৮ দশকে বাংলা ছোটগল্পকেন্দ্রিক যে আন্দোলনগুলি হয়েছিল, যাঁরা ম্যানিফেস্টো বা ইস্তাহার সামনে রেখে গল্প লিখেছিলেন তাঁরা হলেন (১) হাংরি জেনারেশন (২) শাস্ত্রবিরোধী (৩) নিমসাহিত্য (৪) গল্পতন্ত্র ও চাকর সাহিত্য বিরোধী আন্দোলন (৫) ঘটনা প্রধান গদ্য (৬) নতুন নিয়ম (৭) ছাঁচ ভেঙে ফ্যালো (৮) সমন্বয় ধর্মী গল্প (৯) গাণিতিক গল্প (১০) থার্ড লিটারেচার।

১। হাংরি জেনারেশন

ছয়ের দশকে এই আন্দোলনের সূচনা ১৯৬২ সালের এপ্রিলে 'হাংগরি জেনারেশন' পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে। প্রধান পরিকল্পক মলয় রায়চৌধুরী। হাংরি আন্দোলন শুরু হয়েছিল কবিতার মধ্য দিয়ে। পরে গদ্য রচনাও যুক্ত হয়। এঁদের বুলেটিন থেকে কিছু অংশ এখানে তুলে দেওয়া হলো যা এঁদের সাহিত্যের ঘোষিত ইস্তাহার।

1. The merciless exposure of the self in its entirety.

2. To present in all nakedness all aspects of the self and thing before it.

3 To catch a glimpse of the exploded self at a particular moment.

4. To challenge every value with a view to accepting or rejecting the same.

5. To consider everything at the start to be nothing but a 'thing' with a view to testing whether it is living of lifeless.

6. Not to take reality as it is but to examine it in all it's aspects.

7. To seek to find out a mode of communication by abolishing the accepted modes of prose and poetry which would instantly establish a Communication between the poet and his reader.

8. To break loose traditional association of words and the coin unconventional and here-to-force unaccepted Combination of words.

9. To trasmit dynamically the massage of the restless existance and the sense of disgust in a razor sharp language.

10. Personal ultimatum.

উপর্যুক্ত সূত্রগুলির মধ্যেই নিহিত আছে হাংরি জেনারেশনের রচনা সম্পর্কে কৈফিয়ৎ। আত্মার বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মূর্ত। অস্তিত্বকে জানান দিতে হবে সর্বাগ্রে। সমস্ত রকম মূল্যবোধ হবে ধ্বংস। শব্দ ভাষা প্রয়োগ হবে আক্রমণাত্মক ; কোনো ছুঁৎমার্গিতা সেখানে থাকবে না। গতানুগতিক যা, প্রচলিত যা, তার বিরোধিতা করা হবে। হাংরি গদ্য আন্দোলনে তিন গদ্যকারের নাম উল্লেখযোগ্য—বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুভাষ ঘোষ ও সুবিমল বসাক। এঁদের গদ্যে নগ্নতা ও ক্রুরতা প্রকাশ পেল। আত্মার বন্দীত্ব থেকে মুক্তির আর্তি শোনা গেল এঁদের গদ্যে। ব্লেড দিয়ে চিরে চিরে নিজেকে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত করে জীবনকে খোঁজার চেষ্টা করলেন এঁরা। শব্দ-ভাষাকে ক'রে তুললেন প্রচণ্ডরকম তীক্ষ্ণধী। খবর কাগজের হেডিং ব্যবহার করা, জাম্পকাট, বাক্যকে ছোট ছোট করে সাজানো, পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার না করা, সাধু-চলিত বাক্য পাশাপাশি ব্যবহার করা এদের গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য।

২। শাস্ত্রবিরোধী

১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত 'এই দশক' পত্রিকার মাধ্যমে এই আন্দোলনের সূচনা। রমানাথ রায় এর প্রধান পরিকল্পক।

১৯৬২ সালে রমানাথ রায়ের সম্পাদনায় 'এই দশক' বুলেটিন প্রকাশ পেয়েছিল। এই বুলেটিনে কবিতা-গল্প উভয়ই প্রকাশ পেত। ১৯৬৫ সালে এই পত্রিকায় যাঁরা কবিতা লিখতেন, তাঁরা প্রকাশ করেন 'শ্রুতি' পত্রিকা। গল্পকাররা ১৯৬৬ সালে 'এই দশক' নামে শুধু গল্পেরই পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত মোট প্রকাশিত সংখ্যা ২৪।

'এই দশক' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদে লেখা হলো শাস্ত্রবিরোধিতার প্রতিক্রিয়া :

১ গল্পে আমরা আমাদের কথাই বলব।

২ আমরা এখন বাস্তবতায় ক্লান্ত।

৩ অতীতের মহৎসৃষ্টি অতীতের কাছে মহৎ আমাদের কাছে নয়।

৪ গল্পে এখনো যারা কাহিনী খুঁজবে তাদের গুলি করে মারা হবে।

না-গল্পের বিরুদ্ধে প্রচলিত গল্পের বিরুদ্ধে গজিয়ে ওঠা এই আন্দোলন সমসাময়িক সমাজবাস্তবতার উল্টো দিকে পিঠ ঠেকিয়ে শব্দময় হয়ে থাকলো। সমসাময়িক খাদ্য আন্দোলন কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজন, নকশালপন্থী আন্দোলন কোনো কিছুই কল্লোলিত করল না লেখকদের। এরা বললেন স্পষ্টভাবেই 'আমরা এখন বাস্তবতায় ক্লান্ত'।

রমানাথ রায় শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্যের যে দশ বিধি প্রচার করেছেন তা হলো :

১ শিল্পের রাজ্য থেকে সমস্ত তত্ত্ব ও দর্শনের আমূল উৎখাত

২ যা কিছু এতকাল ছিল গম্ভীর এবং যুক্তিপূর্ণ তাই হাস্যকর।

৩ শিল্প ও সাহিত্যে শাস্ত্রসম্মত পথকে বর্জন করতে হবে। শিল্পের ইতিহাস আঙ্গিকের বিবর্তনের ইতিহাস।

৪ জীবন সম্পর্কে কোন রকমের স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ধারণা করা বা মত দেওয়ার আমরা বিরোধী।

৫ সৎ অসৎ, বিশ্বাস অবিশ্বাস, পাপ পুণ্য ইত্যাদির ধারণা রীতিমত সংস্কারাচ্ছন্ন এবং বিরক্তিকর। এসব শব্দগুলো আমাদের কাছে এখন একেবারে অর্থহীন।

৬ পরীক্ষামূলক সাহিত্য কথাটা নির্বোধের উক্তি। সাহিত্য আর যাই হোক গবেষণাগার নয়।

৭ মহৎ সাহিত্য বা চিরকাল সাহিত্য বলে কোন সাহিত্য নেই সব সাহিত্য নিজের কালের এবং যুগের।

৮ গল্প ও উপন্যাস থেকে পারিবারিক সামাজিক রাজনৈতিক ঐতিহাসিক বা আঞ্চলিক সমস্যা, মনস্তত্ত্ব, প্রেম বা অপ্রেম, ভাবুকতা এবং বুদ্ধিমত্তাকে বর্জন করতে হবে।

৯ সাহিত্য থেকে সেকেলে কার্যকারণবাদকে ছুঁড়ে ফেলা হোক।

১০ সাহিত্য দীর্ঘ দিনের সংস্কার ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত হোক।

প্রচলিত শাস্ত্রীয় শিল্প সাহিত্যের বিরুদ্ধে এই জেহাদ ঘোষিত হয়েছিল। গল্পের প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে না গল্প বলার রীতি। এঁদের গল্পগুলি ছবির মতো দৃশ্যমান। ঠিক কি বলব এভাবে এই গল্প নির্মান নয়। এই গোষ্ঠীর নিয়মিত গল্পকার ছিলেন আশিস ঘোষ রমানাথ রায়, অমল চন্দ, কল্যাণ সেন, সুব্রত সেনগুপ্ত, শেখর বসু, সুনীল জানা, বলরাম বসাক প্রমুখ। এছাড়া আরো অনেকেই গল্প লিখেছেন।

৩। নিম সাহিত্য

১৯৭০ সালে দুর্গাপুর শিল্পনগরীতে একদল কল-কারখানার কর্মী যুবক সুধাংশু সেন, রবীন্দ্র গুহ, বিমান চট্টোপাধ্যায় ও মৃণাল বণিক প্রমুখ এই আন্দোলনের সূচনা করেন।

বাংলা সাহিত্যের আন্দোলনগুলি কলকাতা শহরকেন্দ্রিক হলেও কলকাতা থেকে দূরে শিল্পাঞ্চলে এমন একটি আন্দোলন সংগঠিত হলো ১৯৭০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি 'নিম সাহিত্য' পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে। ৩এ/৪৯ রামকৃষ্ণ এভিনিউ থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটির সম্পাদক হিসেবে নাম ছিল সুধাংশু সেন ও বিমান চট্টোপাধ্যায়ের। যদিও এই 'পত্রিকার মূল পরিকল্পনার নকশা রচনায়, প্রতিটি সংখ্যার Lay out, ক্যাপসন্‌স (Slogan বলি না) বিষয়গত নির্বাচন ইত্যাদি ব্যাপারে রবীন্দ্র গুহ'র ভূমিকা ছিল অনেকটা নাছোড়বান্দা' (হাড় ও পাথরের প্রত্নতত্ত্ব বিষয় নিমভাবনা/সুধাংশু সেন। 'বোধ' জানুয়ারি মার্চ '৯০)।

দুর্গাপুরের মতো শিল্প প্রধান অঞ্চলে যেখানে বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন,

সক্রিয়, ট্রেড ইউনিয়ন অটুট, সেখানে নিম সাহিত্য সম্পূর্ণ অন্যরকম ভাবেসাহিত্য বিস্ফোরণ ঘটালো।

এদের পত্রিকার শিরোনামে লেখা থাকতো 'না! সাহিত্য অম্ল সাহিত্য তিক্ত বিরক্ত সাহিত্য। সারা পত্রিকায় নানা জায়গায় ছড়ানো শ্লোগান। যথা—

১ সাহিত্য অভিজ্ঞতার ফল নয়, অবিকৃত অভিজ্ঞতাই সাহিত্য

২ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা ইশারায় বলে দিন

৩ না সাহিত্যে গোপনতা বা চতুরতা বলে কিছু নেই। মূত্রস্থলী টন করলে আমরা দেয়ালের বা ঝোপের আড়াল খুঁজি না।

এঁদের পত্রিকার সূচনা পৃষ্ঠার শীর্ষদেশে ইংরাজী ভাষায় লেখা হতো 'No literature Little Beatle Literature Unliterature A piquant poigrant and Penetrating Kaledeoscope—Stireing the Conventional and Conformist Literary Arena in Doldrums'

এরা 'নিম সাহিত্য' প্রসঙ্গে বলেছেন—

১ নিম গল্পই মানুষের একমাত্র বজ্রমেরুদণ্ড। সমগ্র শরীর উলঙ্গ করে মস্তিষ্কের ভিতর কেউ যদি স্থাপনা করে উদগ্র ছোরা, বুকের মধ্যে অবাস্তব হৃদয়ের পাশে উড়িয়ে দেয় তটস্থ বিষফড়িং, এবং আকছার চাঁদ নয় শুধুই নগ্ননীল মাতাল ফানুস তাহলে কেমন হয়।

২ লেখকের লেখনী থেকে কখনো বেরোয় তিক্ত বিরক্ত গরল ভেদবমি কখনো কটু প্রস্রাব আবার কখনো মাতৃস্তন্যের মত ধবল দুধের ধারা। মানুষের মুখের ভাষা আর হাতের কলম আজ সমান শক্তিশালী।

৩ ঘণ্টায় ঘণ্টায় আকাশের চেহারার মত মানুষের মুখের রঙও পাল্টায়।

৪ আপ্তবাক্যের সাথে সহমত পোষণ না করেই নির্দ্বিধায় বলা যায় জীবনের যাবতীয় স্থাবর দুর্ঘটনাই—নিম সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দু।

৫ জীবনের কোন ব্যাখ্যা নেই কার্য কারণের ভবিষ্যৎ নেই জীবনের কোন ধর্ম নেই কার্যকারণের কোনো ব্যাখ্যা নেই।

৬ নিমভাষার গদ্যছন্দ বলে কোন কথা নেই, যখন যা কিছুর দ্বারা সংক্রামিত গু মুত থুতু লালা অগ্নি গরল রক্ত প্রেম হিংসা সাহিত্যের শরীরে লেপে দিন। জামার হৃৎপিণ্ডের নীচে চাবি। হৃৎপিণ্ডের নীচে নিম সাহিত্য অপক্ক মানুষ ক্রমশঃ শিল্পহীনতার দিকে বন্ধনহীনতার দিকে।

এঁরা যে নিম সাহিত্যের বয়ান দ্বাদশ সংখ্যায় (মার্চ ১৯৭২) ১০ টি সূত্রে রেখেছেন তা এইরকম :

১ ঠিকঠাক ঘটে না কিছুই (শংকরের দায় 'সীমাবদ্ধ' আমরা দায়মুক্ত ।)

২ জীবনের কোনো ধর্ম নেই যা কিছু স্রেফ ধাঁধাঁ । মস্তিষ্ক ও হৃদয় বিসর্জন দিন এবং নারী ফুল চাঁদ ইত্যাদি ইত্যাদি । (সন্দীপনের সামনে 'সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী', আমরা রঙ্গীন মাছ, মাছের খাবার, মাছের সরঞ্জাম ও এ্যাকোরিয়াম বিক্রেতা নই ।)

৩ ব্যারেলের উপর থেকে প্রজাপতিটা উড়িয়ে দিন [রোমান্টিক ঘুঘুরা সাবধান]।

৪ নিজের মগজের ফাংগাস নিজেই উপড়ে ফেলুন, সভ্যতার দাঁতে ভয়ংকর বিষ (অথচ শক্তিপদ রাজগুরু 'ভগবান সজ্জন')।

৫ সাহিত্যের ঐতিহ্য বাতি হয়ে গেছে জীবনেরও আর কোনো ঐতিহ্য নেই। [কিন্তু গীনসবার্গ বাংলাদেশের জন্য কয়েক শত ডলার পারলৌকিক কার্যে দান করেছেন।]

৬ কালীমার্কা ফিনাইলে সাহিত্যের দুর্গন্ধ দূর হয় না। বোধের মূলে নাইট্রিক এ্যাসিড ব্যবহার করুন। [সত্তর দশকের বাংলা উপন্যাস তৃণভূমি, ঘুণপোকা, কোয়েলের কাছে, নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে—বাংলা সাহিত্যের Flitch.]

৭। সাহিত্যে সাহিত্য সুনীতি নিষ্প্রয়োজন। এখন যা কিছু তা ব্যক্তিগত বিস্ফোরণ। [যেহেতু এখন চতুর্দিকে অবিরাম শব্দ শব্দ শব্দ শব্দ শব্দ।]

৮. লেখক হওয়ার বাসনা জাগামাত্রই আত্মহত্যা করুন। [কমল মজুমদার আত্মহত্যা করেছেন বলে আমরা মনে করি না।]

৯. সবাই লিখবেন না কেউ কেউ লিখুন এবং যা কিছু বিরক্তকর তাই লিখুন [তবুও ডাক্তার নীহাররঞ্জনের গল্প-উপন্যাসের সংখ্যা রহস্যময়ভাবে বেড়েই চলেছে।]

১০ কালো চশমা খুলে ফেলুন। সূর্যের দিকে সরাসরি তাকান। [ক্যালভেরী পাহাড়ের যিশু, টেক্সাসের যিশু, চট্টগ্রামের যিশু, দুর্গাপুরের যিশু—সূর্যটা সরাসরি পৃথিবীর দিকে নেমে আসছে।]

[নিম—শ্লোগান নয়, নিম গসপেল নয় : এ যাবৎ এ সম্পর্কে অনেকে অনেক-রকম কূট প্রশ্ন তুলেছেন, তাদের সবাইকে না খুশী, না-তৃপ্ত, না-সন্দিগ্ধ করার জন্য

আমাদের কিছু কিছু বক্তব্য তথা সাহিত্যের Analytical Paraphrase এখানে Etch করে দেখানো হলো]

নিম সাহিত্যের গদ্য আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন মুখ্যত সুধাংশু সেন, রবীন্দ্র গুহ, বিমান চট্টোপাধ্যায় ও মৃণাল বণিক। উদয়ন ঘোষ, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, বারীন ঘোষাল, অরুণেশ ঘোষ, সুবো আচার্য, প্রদীপ চৌধুরী, অজয় নন্দী, নৃসিংহ রায়, প্রিতম মুখোপাধ্যায় প্রমুখরাও লিখেছেন নানা সংখ্যায়।

৪। গল্পতন্ত্র ও চাকর সাহিত্য বিরোধী গল্প আন্দোলন

জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭ যে ১৯৭০ সালে ২৩ এ পূর্ণ মিত্র প্রেস কলকাতা ৩৩ ঠিকানা থেকে 'গল্প' পত্রিকা প্রকাশ পায় সুব্রত সেনগুপ্তর সম্পাদনা ও প্রকাশনায়। সুব্রত সেনগুপ্ত'র নাম আগেই পরিচিত শাস্ত্রবিরোধী গদ্যকার হিসেবে। শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের সমসাময়িক ও পরবর্তীকালে প্রচলিত গল্পের বিরোধিতা করে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশ পায় সেগুলি গল্প, অব্যয়, নতুন নিয়ম, কৌস্তুভ, নির্মিত, অক্ষর, চোখ, গল্পপত্র, অধুনাসাহিত্য, চিল, ঈগল প্রভৃতি।

> 'গল্প' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক লিখেছেন, 'সাহিত্য ক্রমশঃ চাকর-দের কুক্ষিগত হয়ে পড়ছে। এদের কেউ রাজনীতির আবার কেউ বক্তব্যের চাকর। আমরা চাই সাহিত্যকে চাকরদের হাত থেকে মুক্ত করতে। আমাদের পত্রিকা সাহিত্যকে মুক্ত করার এই আন্দোলনের হাতিয়ার হয়ে উঠুক। কিন্তু সাহিত্যকে আমরা কোন কিছুর হাতিয়ার করতে চাই না।'

চাকর সাহিত্য উচ্ছেদের জন্য প্রকাশ পেল 'গল্প'। পত্রিকার ৩ সংখ্যায় সুকুমার ঘোষ 'লেখক কী দিতে পারে পাঠক কী চাইতে পারে' আলোচনায় জানাচ্ছেন, আমরা নতুন কিছু লিখবো, অর্থাৎ পুরোনো গল্পের থেকে এর গঠন হবে আলাদা। কয়েকটি জিনিস করবো না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম :

১. আমরা মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করবো না। প্রতিটি ঘটনার অগ্রপশ্চাৎ আছে, এমন বিবেচনা করা মূর্খতা। আমরা দেখেছি, গল্প যাতে আরো ঘোরালো আরো পাঠকবিনোদ্য হয় সেই অভিপ্রায়ে লেখকেরা মানুষের স্থূল অনুভূতিতে সুড়সুড়ি দিয়েছেন। এতে সাহিত্য ভোজ্য হয়েছে, নৈবেদ্য হয়নি।

২. আমরা তথাকথিত কাহিনীকে প্রশ্রয় দেবো না। কার্যকারণ পরম্পরা যার জনক সেই ঘটনা ভীষণ ছেলেমানুষি। এই ফানুস আরো ফুলে ওঠে রহস্যময়ী

নারী বা সাংখ্যোক্ত নির্বিকার পুরুষের ওরফে লেখকের স্বেচ্ছা অসহায়ত্ব-বরণে। লেখক যখন দৈবজ্ঞ, তখন এই অসহায় অবস্থা দারুণ হাস্যকর।

৩. যতোটা সম্ভব চরিত্র বর্জন করবো। এই সূত্রটি অবশ্য পূর্বপ্রতিজ্ঞারই জের। তবে চরিত্র সরাসরি কাহিনীর দায়ভাগ গ্রহণ করে না। তা না হলেও, চরিত্র বলতে আমাদের বোঝানো হয়েছে তাতে একটা আদ্যোপান্ত আছে আর আছে, যত্রতত্র কাণ্ডজ্ঞানের দাপট লেখকের অভিভাবকত্ব থেকে মুক্ত চরিত্র, বোধ-হয়, আমরা এখনো সৃষ্টি করতে পারি নি। আমার দায়দায়িত্বের হাত না সরালে যথার্থ কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি অসম্ভব।

'গল্পতন্ত্র নিপাত যাক' নিবন্ধে (গল্প সংকলন ১০) পার্থ গুহবক্সী প্রচলিত গল্পের মালমশলায় কি থাকে তা বিশ্লেষণ ক'রে সেই তথাকথিত গল্পের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করতে চেয়েছেন। এখানে ওই নিবন্ধ থেকে প্রচলিত গল্পের ছক ও গল্পতন্ত্রের বিরুদ্ধে ৬ দফা 'ফতোয়া'কে তুলে ধরা হলো :

ক. গল্পে থাকতে হবে সাধারণ এবং অসাধারণ মানুষদের সুখ, দুঃখ, স্বপ্ন, ভয়, ভালবাসার কাহিনী।

খ. প্রতিদিনের একঘেঁয়ে জীবনে অপ্রত্যাশিত কোন ঘটনা ঘটিয়ে ফেলা এবং সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পাত্র-পাত্রীর যেরকমটি হওয়া উচিত ঠিক সেইরকম কার্যকলাপ দেখিয়ে দেওয়া।

গ. কোন বিশেষ পরিস্থিতির সুযোগে লেখকের খেয়ালখুশিমত চরিত্রদের মানসিক বিশ্লেষণ করা।

ঘ. গল্পের ছোট পরিসরে 'হৃদয়ের গভীর আবেদন', 'সমাজব্যবস্থার অসমতার ইঙ্গিত' ইত্যাদি পৌঁছে দেওয়া এবং পাঠকের মন করুণরস কিংবা রৌদ্ররসে ভরিয়ে দেওয়া।

ঙ. গল্প জুড়ে নির্দিষ্ট কোন সমাপ্তির ভিত তৈরী করা এবং গল্পের শেষে মোড ঘুরিয়ে পাঠককে চমকে দেওয়া।

চ ... ...

উপর্যুক্ত গল্পতন্ত্র বা চাকর সাহিত্যের বিরোধিতা করে 'একেবারে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এই ফতোয়া জারি করা হল :

১. এখন থেকে লেখক কিভাবে একটি গল্প গড়ে তোলেন, সেই বিশেষত্বের উপরে লক্ষ্য রাখতে হবে।

২. গল্প পড়ার আগে থেকেই কোন নির্দিষ্ট প্রত্যাশাকে পুষে রাখা চলবে না। কোন লেখক অমুকভাবে গল্প লিখেছেন, তিনি কেন তমুকভাবে আরেকটি গল্প লিখলেন ; এই ধরণের অভিযোগ করা ছেলেমানুষী ছাড়া আর কিছু নয়।

৩. অন্যের জীবনকাহিনীর বদলে লেখকের নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা গল্পের মধ্যে পাওয়া গেলে, লেখক কি বলতে চেয়েছেন তা নিয়ে হইচই করা চলবে না।

৪. লেখক যদি বাস্তব জগৎ এবং নিজের মনোমত জগৎ, এই দুটিকে একাকার করে দেন, তবে সেই জগৎকেই পাঠককে নিজের করে নিতে হবে।

৫. লেখক পাঠককে কোন অসমাপ্ত জায়গায় ছেড়ে দিতে পারেন, যেখানে পাঠককেই রহস্য ভেদ করার জন্য এগিয়ে যেতে হবে। এবং

৬. প্রতিদিন অন্তত একটি গল্প পড়ার অভ্যাস তৈরী করতে হবে।

পাঠক, গল্পতন্ত্রকে ভেঙ্গে ফেলার পক্ষে ও বিপক্ষে নিজেকে তৈরী করে নিন।

'গল্প' পত্রিকার লেখক ছিলেন সুব্রত সেনগুপ্ত, পার্থ গুহবক্সী, আশিস মুখোপাধ্যায়, তীর্থঙ্কর নন্দী, তাপস চৌধুরী, সমীরকান্তি বিশ্বাস, প্রিয়ব্রত বসাক, অতীন্দ্রিয় পাঠক, হেমন্ত প্রধান, সুকুমার ঘোষ, সুনীল জানা, বলরাম বসাক, সুব্রত নিয়োগী, সুবিমল মিশ্র প্রমুখ।

৫। ঘটনা প্রধান গদ্য

৭-এর দশকের গোড়ায় 'এবং নৈকট্য' পত্রিকার মাধ্যমে এই আন্দোলনের সূচনা। এর প্রধান প্রবক্তা অচিন্ত্য কুমার সাঁতরা। ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত এই ধারায় 'এবং নৈকট্য' পত্রিকা গোষ্ঠী গদ্য আন্দোলন চালিয়েছিলেন। ৭০ বসাক বাগান পাতিপুকুর কলিকাতা ৪৮ থেকে প্রকাশিত 'এবং নৈকট্য' পত্রিকার প্রচ্ছদে লেখা হতো 'ঘটনা প্রধান 'এবং নৈকট্যে' গল্প বা গপ্পো অথবা ঐ জাতীয় কিছু ঠাট্টা মস্করা পাঠানো বন্ধ রাখলে কৃতজ্ঞ থাকবো।'

গল্প লেখার চিরাচরিত পদ্ধতিকে এরা মানেননি। এদের মতে গল্প বানানো হয়ে থাকে। লেখক কি করে গল্পের চরিত্রের উপভোক্তা হবেন ? গল্প শব্দের বদলে এরা 'ঘটনা' শব্দটি ব্যবহারে উৎসাহী. ঘটনার সন্নিবেশ হতে হতে বা জমতে জমতে ঘটনার বিরাট এক যোগফল হয়ে দাঁড়ায় এবং তা ঘটনাই। এর মধ্যে এক

ছিটেও মিথ্যে থাকে না, চিন্তার টানাপোড়েন থাকে না, ইঙ্গিতময়তা থাকে না, থাকে না কোনভাবে ভাঁওতা দিয়ে পয়সা রোজগারের ফিকির কিংবা কোন ধরণের গল্পও। শুধু দেখার এবং শোনার কাজগুলো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিবৃত করা। অতীত নয়, বর্তমান নয়, ভবিষ্যৎ নয়—কারণ শুদ্ধ ও নির্বিকার ঘটনার কাছে এসব একাকার। একাকার এই জন্যে যে কোন কিছু ধার করা কিংবা কোন মহৎ পদচিহ্ন ভবিষ্যতের জন্যে ফেলে যাওয়া ঘটনার কাজ নয়। এবং তা করলেই একটি ভালোমানুষী গোলগাল গপ্প হবে, ঘটনা নয়। তাই গপ্প গল্প বড়োগল্প ছোট গল্প নিয়ে ছেঁদো ভাবা শব্দ বাক্য দিয়ে কিছু ফেঁদে বসা নয়—পরন্তু বিষয় নিরপেক্ষ ঘটনাই উল্লিখিত করা। আর তাইই বলছিলুম, গল্পমি গপ্পমি বন্ধ হয়ে সাহিত্যে এসে পড়ুক 'ঘটনা' নামধেয় একটি অনুচ্ছেদ—যা নিতান্তই আত্মমগ্ন এবং সত্য।

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিটি ঘটনা গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যে গল্প গপ্পো বড়ো গল্প ছোট গল্প ঘটনা' আলোচনা থেকে তুলে দেওয়া হলো (এবং নৈকট্য ২ বর্ষ ২ সংখ্যা অক্টোবর ১৯৭২)। ঐ সংখ্যায় লেখকদের উদ্দেশ্যে বলা হলো : 'মানুষের জীবনকে নিয়ে আর কতদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষার নাম করে গপ্পো ফাঁদবেন ? আর কতদিন সহানুভূতির ন্যাকা মুখোশ পরে স্যাণ্ডউইচ খেয়ে থুতু দিয়ে চোখের পাতা ভেজাবেন ? আর কতকাল এভাবে ঈশ্বর সেজে সর্বজ্ঞ হয়ে অত্যাচার চালাবেন ? ? ?' এরা গতানুগতিক গদ্য ভাবনার সঙ্গে কোন-ভাবেই একাত্ম হতে পারেন নি। এদের মতে এতদিন পর্যন্ত গল্পোই লেখা হয়েছে কিন্তু তা লেখকের কাছে অসততা। ঘটনা প্রধান গদ্য আন্দোলন সম্পর্কে এদের বিশ্লেষণকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দেওয়া হলো দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের উল্লিখিত আলোচনা থেকে।

১. চরিত্রের আগামী সংলাপ গতি মনোভাব সমস্ত কিছুই বলা হয়ে চলেছে। এতদিন এসবই চলছিল। কিন্তু আজ আর চলবে না। সনাতন কারবারের চাকা সাহিত্যের নিখাদ মাটিতে বসে যাবেই। আর সেই ফাঁকে মারা পড়বে কল্পনা বিলাসিতা, ভবিষ্যতদর্শিতা ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই আর দেবতাইজম নয়। দেবতাবাদটাকে অনন্তকালের জন্য বাদ দেওয়া হোক, এর কারণ—লেখক অন্য কিছু নন, তিনিও আর পাঁচটা লোকের মতই মানুষ। এ জন্যেই তাকে মানুষ হয়েই পাঠকের কাছাকাছি, পাঠকের শরীর নিয়ে পাঠকের মুখোমুখি বসে কথা বলতে হবে।

[পূর্ববর্তী গল্প যেহেতু] ১। রবীন্দ্র পর্বে মনস্তত্ত্বের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন প্রকাশবাদের মিলন। ২। তিরিশের দশকে মনস্তত্ত্বের সঙ্গে অস্তিত্ববাদের সহাবস্থান এবং প্রতীকের আশ্রয়, আবার তার সঙ্গে গ্রাম শহর চষে ফেলে ধরে আনা চরিত্রের এক ধরণের মিশেল। ৩। বাস্তববাদীয় পূর্ণ ধাঁচ এবং গোলগাল গল্পের প্যাটার্নযুক্ত চল্লিশের দশক ৪। ৫০-এর দশক-এর গল্পের মধ্যে কাব্যের মেজাজ এবং স্যুররিয়ালিজম। গল্পকে কবিতার কাছাকাছি নিয়ে আসার একটা আন্দোলন। ৫। জীবন জটিলতা এবং যুগ জটিলতার ফলে ব্যক্তির অন্তর্মুখীনতা আর তার ফলে মধ্য ষাটের লেখকদের মধ্যে নতুন গড়াপেটা প্রকাশবাদের আবির্ভাব এবং অন্যদিকে অন্তরাত্মার জটিল রহস্যময় মানুষটাকে নিয়ে লেখার তাগিদ। এর থেকে একটা জিনিষ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে ষাট দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত গল্পে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে রাজনীতি সমাজনীতি মনস্তত্ব দর্শন নাটক—এ সব আর দেবতাইজমের মাধ্যমে নানান ধরণের চরিত্রের ব্যাখ্যা-এর পাশাপাশি রয়েছেই। সবই হয়েছে কেবল নিজের আত্মার কথাটাই বলা হয়ে ওঠে নি। তাই বর্তমান দশক এল সমস্ত রকম গল্পত্ব সরিয়ে অর্থাৎ কিনা যার মূল কথা anti story।

২। কেউ আমাদের জানে না আমরাও কাউকে জানি না। অতি আপন চোখ, কান আর মনকে বিশ্বাস করে লিখে যাওয়া। তাঁর নিজের দেখা পারিপার্শ্বিক চরিত্র কিংবা বস্তু দুইই উপজীব্য হয় এবং হয়ে পড়ে একটি বিবৃতির মাধ্যমে। এর মধ্যে কোন রহস্য উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টা থাক না। থাকে না একটি পরিপূর্ণ গল্পের স্বাদ অথবা নিটোলতা। পরন্তু দৃষ্ট বিষয়ের ওপর সম্ভব সুযোগমত আলোকপাত। সে কৃত্রিম উপায়ে কোন ম্যাইম্যাক্স দরকার হয় না।

৩। সাহিত্য যেমন জীবন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা নয়, তেমনিই নয় 'আমি' ছাড়া অন্য কোন প্রকাশ মাধ্যমকে প্রশ্রয় দান করা। গল্পের (?) মধ্যে যদি 'আমি' চরিত্র হাজির থাকে তাহলে সত্যের অপলাপ হবার সম্ভাবনা যেমন কম তেমনিই কম বক্তা এবং শ্রোতার মধ্যে পার্থক্যের কোন সুযোগ সৃষ্টির কারণ আমি নিজে যা দেখছি, নিজে যা শুনছি তাইই আসলে মোমেণ্ট হতে পারে, থীম হতে পারে।

৪। গল্প—শব্দটা তা ছোট বা বড়ো বা যুক্তই হোক না কেন একটা সময় কাটানো, খোসমেজাজী ভাব মনস্তত্বে কাজ করতে শুরু করে। কারুর দুঃখের ঘটনা সময়ের দুশ্চিন্তা কিংবা কোন সুখের ব্যাপার ইত্যাদি সংবাদগুলো অন্যের কাছে সময় কাটানোর একটা খোরাক আর অবশেষে 'গল্প' হতে বাধ্য।

৫। লেখক যদি অনবরত নিজের কথাই বলে যেতে থাকেন, তবে তো সমাজের প্রতি তাঁর কোন রকম দায় দায়িত্বই হইল না। কিংবা সমাজে দৈনন্দিন খেটে যাঁরা রুজি রোজগার করেন—তাঁদের কথা তাহলে বলবে কে? প্রশ্নকর্তাকে বলব, আবার আপনার ভুল হচ্ছে। কারণ লেখক শুধুই নিজের জটিল অন্তর রহস্যের কথা বলবেন, অন্য কারুর দিকে তিনি তাকাবেন না। অন্য লোকেদের দিকে তাকাবার জন্যে অনেকেরা রয়েছেন। রাজনীতিক দার্শনিক মনস্তত্ত্ব-বিদ সর্বোপরি একজন লেখক আছে—। অন্য লোকের জীবন দিয়ে টানাটানি যেমন হতেই পারে না তেমনই সময় কোথায় সেই সব জীবন নিয়ে গল্পের মালা গেঁথে চলা।

৬। যে জিনিষ বাস্তব ঘটছে তাকে গল্প ওরফে গপ্প বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। বরং তাবৎ 'গল্প' শব্দটার বদলে নামকরণ করা যাক—'ঘটনা'। ঘটনার সন্নিবেশ হতে হতে বা জমতে জমতে ঘটনার বিরাট এক যোগফল হয়ে দাঁড়ায় এবং তা ঘটনাই। এর মধ্যে এক ছিটেও মিথ্যে থাকে না, চিন্তার টানাপোড়েন থাকে না, ইঙ্গিতময়তা থাকে না, থাকে কোনভাবে ভাঁওতা দিয়ে পয়সা রোজগারের ফিকির কিংবা কোন ধরণের গল্পও। শুধু দেখার এবং শোনার কাজগুলি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিবৃত করা।

'এবং নৈকট্য' পত্রিকার ২ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা এপ্রিল জুন ১৯৭৩-এর শেষ প্রচ্ছদে প্রকাশিত ইস্তাহারে ঘটনা, আন্দোলনের মূল্য বক্তব্য তুলে দেওয়া হলো :

কেন গল্প নয়—শুধু সাহিত্যাশ্রয়ী ঘটনা, কেন কেউ নয়—শুধু আমি।

যেহেতু কোনো মাধুর্যই কোনো মানুষের অন্তরঙ্গ জগতের কোন খোঁজ পায় না—তাই, এতকাল ধরে মানুষের সুখ, দুঃখ, যন্ত্রণা, ব্যর্থতা, প্রেম প্রভৃতি নিয়ে লেখার মধ্যে যে ধরণের দেবতাইজমের ছড়াছড়ি চ'লে আসছে—সাধারণের কাছে সেগুলোর সংজ্ঞা ঠিকই, অর্থাৎ বানিয়ে বানিয়ে তৈরী একটা গপ্প ; যা কিনা পুরোপুরি মিথ্যের ওপর দাঁড় করান। কেননা জনমানসে 'গল্প' শব্দটা একটা সময়কাটান, খোসমেজাজী, কপট রাগ কিংবা দুঃখ কিংবা আনন্দ বয়ে নিয়ে আসে। আর এ কারণেই কারুর জীবনের কোন ঘটনাকে আমরা 'গপ্প' বলে সস্তা করে দিতে চাই না—বদলে বলব 'ঘটনা'। যার মূলসূত্র : ১) লেখকের শোনা, ভাবা, দেখা খানিকটা সময়, ২) চারপাশের দৃষ্টিগ্রাহ্য, শ্রুতিগ্রাহ্য কোন বস্তু বা ব্যক্তি এবং লেখক, ৩) লেখকের আত্মা এবং লেখক। আর এগুলোর সত্যতা

নির্ভর করছে 'আমি' নামক শব্দের মুখ্য ভূমিকায়। 'আমি' হল আমারই জটিল মানসিকতা অর্থাৎ লেখার মধ্যে সাবজেকটিভ ভূমিকার আবির্ভাব। ঘটনার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এর বিষয় নিরপেক্ষতা। প্রকৃত ঘটনায় তাই দার্শনিকতা, মনস্তত্ব, ধারণা, ধর্মীয় আচরণ, ন্যায়নীতি, রাজনীতি ইত্যাদির স্থান থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে। তাই আমাদের বক্তব্য: সমস্ত রকমের 'গল্প' সরিয়ে বিষয়-নিরপেক্ষ ঘটনাই উল্লিখিত করা। অথচ যার মধ্যে নিহিত রয়েছে সাহিত্যের আত্মমগ্নতা, সত্যতা এবং সৌন্দর্য।

ঘটনা প্রধান গোষ্ঠীর মূল গল্পকার ছিলেন অচিন্ত্যকুমার সাঁতরা (সম্পাদক), দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, সুভাষ গুহ রায়, সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঘনশ্যাম দাস, অসীম ঘোষ প্রমুখ।

৬। নতুন নিয়ম

১৯৭৮ সালে 'নতুন নিয়ম' পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে নতুন নিয়ম গল্প আন্দোলনের সূচনা। পত্রিকার প্রকাশক, আশিস মুখোপাধ্যায়। ঠিকানা ১৬/৫ ডোভার লেন ফ্ল্যাট এ-২৩ কলকাতা ৭০০০২৯।

'নতুন নিয়ম' এর গল্পরীতি প্রসঙ্গে 'নতুন নিয়ম' পত্রিকার ৬ সংখ্যাটি (এপ্রিল ১৯৮১) দ্রষ্টব্য। এই সংখ্যায় ৪টি নিবন্ধ লিখেছেন তাপস চৌধুরী, পার্থ গুহবক্সী, তীর্থঙ্কর নন্দী ও আশিস মুখোপাধ্যায়।

তাপস চৌধুরীর 'নতুন নিয়ম কেন' নিবন্ধটিকে আমরা ১০টি সূত্রে ভাগ করতে পারি লেখকের বক্তব্য অনুসারে:

১. পুরনো কোন নিয়মকে আশ্রয় করে সৎ এবং শুদ্ধ সাহিত্য রচনা অসম্ভব।

২. কাহিনী বা প্লট আর নয়।

৩. গল্পে থাকবে শুধু শব্দ। শব্দই আজ ছোটগল্পের প্রধান উপকরণ শব্দচয়ন শব্দগঠন শব্দস্থাপনকেই জরুরী মনে করি।

৪. শব্দই নির্দেশ দেবে চরিত্র বা চরিত্ররা কোথায় কখন কিভাবে বসবে দাঁড়াবে চলবে থামবে এবং কথা বলবে। শব্দ যেখানে গিয়ে একেবারে থামবে অর্থাৎ যতদূর গিয়ে তার আর এগিয়ে যাবার ক্ষমতা থাকবে না, গল্প সেখানেই শেষ হবে।

৫. গল্পে কাহিনী নয় বিষয় থাকবে যা শব্দের মাধ্যমে গড়ে ওঠে।

৬. বক্তব্য বা তত্বপ্রচারের ক্ষেত্র আর যাইহোক, গল্প নয়।

৭. নতুন শব্দ ও নতুন বিষয় সার্থক ছোটগল্প হয়ে ওঠে যখন সে দাঁড়িয়ে

থাকতে পারে নতুন আঙ্গিকের ওপর নিজস্ব আঙ্গিক তৈরী করতে হবে লেখককে।

৮. অন্তর্জগতের রহস্য উন্মোচন করাই হবে আমাদের প্রধান কাজ।

৯. পাঠকও লেখকের অন্তর্জগতে প্রবেশ করতে চায়।

১০। পাঠক গতানুগতিক কাহিনীর ঘোলা জল থেকে নিষ্কৃতি চাইছে। উপমা, অলংকার ও বিশেষণের ব্যবহার বিরক্তিকর। আবেগময় প্রাকৃতিক বর্ণনায় তারা ক্লান্ত বোধ করছে। লেখকের কোন কিছুতে উচ্ছ্বাস করাকে তারা ভাল চোখে দেখছে না।

'নিয়মভঙ্গকারী একজন' নিবন্ধে পার্থ গুহবক্সীর বক্তব্যকে সূত্রাকারে রাখা হলো :

সাহিত্যকে যখনই স্থূল কিছু নিয়মের মধ্যে বেঁধে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, চিন্তায় স্বাধীন এমন কিছু মানুষ তখনই বার বার তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। এই ইতিহাস হয়ত নতুন নয়। পুরনো ইতিহাসের কাছে থেকে শিক্ষা নিয়ে এই মুহূর্তে আমরা আরেক ইতিহাস তৈরী করতে বলেছি। কারণ আমরা দেখতে পেয়েছি আধুনিকতার গিল্‌টি করা সাহিত্যের পিছনে এখনো গোঁড়া মনোবৃত্তি কাজ করে চলেছে। যে কামিনী কাহিনী নির্ভর গল্পকে এক সময় নিরোধ করা হয়েছিল, তাকে আবার কবর খুঁড়ে সুকৌশলে উদ্ধার করা হচ্ছে। এই মুহূর্ত থেকে গল্পের এইসব অকাল বান্ধবদের বিরুদ্ধে আমাদের মিলিত শক্তি প্রয়োগ করা হবে। যে ভয়ংকরি বিদ্যা প্রচলিত মানসিকতার চর্চাকে উৎসাহ দেয়, আত্মসচেতনার রাস্তা বন্ধ করতে পরদুঃখকাতর হতে শেখায়, এই মুহূর্ত থেকে তাকে আমরা বাতিল বলে ঘোষণা করছি। এই মুহূর্ত থেকে সমস্ত চেনাজানা নিয়মের বাইরে আমরা দাঁড়াতে চাই।

১. নিয়মানুগ সাহিত্য আমাদের কাছে সাদা কাগজ ছাড়া কিছু নয়।

২. আমরা নিয়ম বিলোপ করবার সমর্থক, কিন্তু বন্দুক থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যেমন বন্দুকধারণ করা দরকার, ঠিক সেই রকম নিয়ম বদ্ধভাবে আমরা সমস্ত নিয়ম ভেঙে দিতে চাই।

৩. নিয়ম বর্জন করবার জন্য নিজস্ব মানসিকতা অর্জন করা দরকার।

৪. যুক্তিসম্মতভাবে বস্তুকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, নিয়মমাফিক জীবন-যাপনের ফলে পরিচিত বস্তু সম্পর্কে যেসব ধারণা মনে বদ্ধমূল হয়ে থাকে, তাদের বাদ দিয়ে নতুন পরিচয় খুঁজতে হয়।

৫ মনের ভাবকে অক্ষরের মাধ্যমে হুবহু প্রকাশ করবার মত ভাষা তৈরী হয়নি। তাই লেখার সময় প্রতিটি শব্দকে নতুন ভাবে ব্যবহার করতে শিখতে হয়।

৬. এই নতুন নিয়ম সমস্ত কৃত্রিমতার জাল ছিঁড়ে ফেলে চিন্তার স্বাধীনতাকে সবার আগে স্বীকৃতি দেয়।

'নাতিদের গল্প' নিবন্ধে তীর্থঙ্কর নন্দী বলেন,…'বছরের শেষে আমরা প্রত্যেকেই নতুন দেওয়াল পঞ্জী দেওয়ালে ঝোলাবার জন্য ছটফট করতে থাকি। পুরোনো পঞ্জী আমাদের কাছে তখন মূল্যহীন হয়ে পড়ে। নিয়ম মতো নতুন পঞ্জীতে আমরা চোখ রাখি। নতুন পঞ্জীতে আমাদের ক্ষোভ থাকে না। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম।

অথচ সব নিয়ম জানা সত্ত্বেও আমরা কখনও সাহিত্যের নতুন 'আমি'তে স্বাভাবিক হতে পারি না। পুরোনো 'আমি' তখনও আমাদের মনে মনে শোভা পেতে থাকে। মহামান্য মনোবিজ্ঞানীদের কথা শুনেও আমরা শোনার ভান করি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পরিবর্তনকে অস্বীকার করি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে 'আমি'রাও যে বদলায় কখনও বুঝতে চাই না।

একশ বছরের পুরোনো 'আমি' আজ আর সাহিত্যে নেই। থাকলেও আমরা ভালবাসি না।…বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এক সময় আমরা দেখতে পাই সাহিত্যে লেখকের সরাসরি ছাপ এবং উপস্থিতি। 'আমি' দিয়েই যেন লেখক সব বোঝাতে চায়। লেখা শুরুই হয় 'আমি' দিয়ে।

সব জানা সব মানা এবং ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও সাহিত্যে নতুন প্রকাশ ভঙ্গি নতুন 'আমি' দেখলেই কিছু লেখকের গলায় সব সময় নীল কফ জমে।…

আজকের কোন নতুন প্রকাশ ভঙ্গিতে কিংবা নতুন 'আমি'তে একজন লেখকের নিজস্ব পরিবেশ হয়ে ওঠে অনেক ব্যাপক এবং সুদূর প্রসারী। আজ একজনের এই 'আমি' যেন বিশ্ব 'আমি' তাই আজ যদি কোন লেখক 'আমি' দিয়ে শুরু বা শেষ না করে 'আমরা' তোমরা ইত্যাদি দিয়ে শুরু বা শেষ করে তা হলে সমালোচকরা অবাক হবেন না। অথচ নাতিরা মানবে না।…নতুন নিয়মের 'আমি' হয়ে উঠবে তাদের নিন্দার খোরাক অথচ নতুন নিয়ম এগিয়েই চলবে। এই নিয়ম কোথাও বেঁধে থাকবে না।'

আশিস মুখোপাধ্যায় 'ছায়া সাহিত্য : ধর্মে অধর্মে' : দীর্ঘ নিবন্ধে প্রথাবিরুদ্ধ সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 'নতুন নিয়ম, সমাজ সচেতন নয়' এই সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রী মুখোপাধ্যায় বলেন : 'আমরা শ্রেণী সচেতনতার কথা

বলি না। অথবা নতুন নিয়মীরা যথেষ্টভাবে শ্রেণী সচেতন নন। এই ধারণাটি আমাদের ছোটগল্পের ক্ষেত্রে বেশ প্রচলিত। শ্রেণীসচেতনতা অর্থ এইসব লেখক সমালোচকদের ধারণায় দরিদ্র ও নিপীড়িত শ্রেণীর সম্বন্ধে ওকালতি করা। 'লেখক ও ঈশ্বরে কোন ভেদ নেই' গতকালের এই ধারণাটির সঙ্গে আজ অনেকেই বলতে আরম্ভ করেছেন লেখককে আসলে একজন 'ধুরন্ধর উকিল হতে হবে'। মস্তিষ্কের ব্যায়ামে অনাগ্রহী পাঠকেরা ঐ বাস্তব সত্য ধারণাটির সঙ্গে সঙ্গে জীবনমুখী সাহিত্য শিবির নামক কোন শিবির বিলাসীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এইসব কথাবার্তা বলে থাকেন। এই ধরণের ভুল ধারণা ও প্রচারকে উপেক্ষা করে বলা যায়, জীবনের সঙ্গে নতুন নিয়মের জীবিত লেখকদের কোন বিরোধ নেই। এই সব পাঠক সমালোচকরা সমাজ সচেতনতা সম্বন্ধে মনে মনে যে ধারণা পোষণ করেন এবং আমাদের গল্পের শরীরে তার অনুপস্থিতির জন্য কান্নাকাটি করেন, তাঁদের ধারণা আসলে গল্প সম্বন্ধে কিছু অলস ও জড় ধারণা ছাড়া কিছু নয়।'

৭। ছাঁচ ভেঙে ফ্যালো

এই শিরোনামে ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে লেখা নিবন্ধে (দ্রষ্টব্য, ছাঁচ ভেঙে ফ্যালো, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৭৫) অমল চন্দ জানিয়েছেন 'কোন সমস্যা নিয়ে গল্প লেখার দিন আর নেই, কিন্তু গল্প লেখার সমস্যাটা আছে, থেকে যাবে। ইচ্ছে হলেই একটা গল্প ফাঁদা চলে গল্প লেখা চলে না। দ্বিতীয়টা নিয়েই সমস্যা, প্রথমটা ছাঁচে ঢালা। ছাঁচে ঢেলে দিলে প্রথমটা হতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয়টার বেলায় কোন ছাঁচ নেই বলেই ভাবতে হয় কেমন করে লিখব।' শাস্ত্রবিরোধী গল্প আন্দোলনে এই পুরনো ছাঁচ ভাঙা হয়েছে। 'ছাঁচ ভেঙে ফ্যালো' নামে পত্রিকাটি অমল চন্দ প্রকাশ করেন ৭৪০ শরৎ চ্যাটার্জী রোড, হাওড়া ৪ ঠিকানা থেকে অক্টোবর ১৯৭৯ সালে।

১ বর্ষ ১ সংখ্যার প্রচ্ছদে জানানো হয়েছে 'ছাঁচ ভেঙে ফ্যালো' চার মাস পর পর বেরোবে। এর কাজ উপন্যাসের আন্দোলন বা উৎপাত। এই আন্দোলনের তত্ত্ব তৈরী করার মত টিকিও নেই, নস্যিও নেই। এর যা কিছু তত্ত্ব তা এখন নামেতেই থাকে। সব চঞ্চল চঞ্চল হয় না। কিন্তু ছাঁচ ভেঙে ফ্যালো ছাঁচ ভাঙবেই। এই উৎপাত চলতেই থাকবে। এর যম-দুয়ারে ভালো করেই কাঁটা পোঁতা হয়েছে। এই উৎপাতের সূচনা হল অমল দত্তের উপন্যাস দিয়ে।

৮। সমন্বয়-ধর্মী গল্প

১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অজিত দেব ও সুধীর দাস ৮/৯ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা ৯ থেকে এই নামে প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করেন। এই সংখ্যায় অজিত দেবের ৬টি ও সুবীর দাসের ৩টি গল্প ছিল। গতানুগতিক গল্পধারার বিপরীতে সমন্বয়-ধর্মী গল্প আন্দোলন। এই পত্রিকার পেছন মলাট থেকে এঁদের বক্তব্য তুলে দেওয়া হল :

১. সমন্বয়-ধর্মী গল্প আদি-মধ্য-অন্ত নিয়ে গঠিত কোন গল্প নয়।

২. সমন্বয়-ধর্মী গল্প যে সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রচলিত শিল্পগুণ-সম্মত হবে, তাও নয়।

৩. সমন্বয়-ধর্মী গল্প প্লটলেশ, দীর্ঘ সংলাপহীন, কেবলমাত্র অনুভূতির ওপর নির্ভরশীল, তাও নয়।

৪. আমরা চাই উভয়ের সমন্বয় সাধন। এমন গল্প যা টগবগ করে ফুটবে। এতে কী থাকবে বা থাকবে না তা নির্ভর করবে গল্পের ফর্ম ও তার বিষয়বস্তুর ওপর। আমাদের গল্প হবে গল্প জগতের সকল প্রকার সংস্কার মুক্ত। যার নাম সমন্বয়-ধর্মী গল্প।

৯। গাণিতিক গল্প

সূচনা : জানুয়ারি ১৯৮০তে 'ছয়' পত্রিকাপ্র কাশের মাধ্যমে। কলেজে পড়া-কালীন গণিত বিভাগের ছয় ছাত্র মিলে এই পত্রিকা প্রকাশ করেন ২২২ ব্লক বি, বাঙ্গুর এভিনিউ কলিকাতা ৫৫ থেকে। এঁরা হলেন চিরঞ্জয় চক্রবর্তী, অনুপ সেনগুপ্ত, অরিন্দম দাস, মানস বসু, প্রবুদ্ধ ভট্টাচার্য ও ঐন্দ্রিলা সেনগুপ্তা। গাণিতিক সাহিত্যের মুখপত্র হিসেবে 'ছয়—৬' প্রকাশ পেয়েছিল। বিভিন্ন সংখ্যায় এরা পত্রিকা সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করেছেন।

গাণিতিক গল্প আন্দোলন সম্পর্কে আলাদাভাবে কোনো 'ম্যানিফেস্টো' এরা প্রকাশ না করলেও পত্রিকার বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে ও পত্রিকার পেছনের মলাটে মুদ্রিত বক্তব্যের মাধ্যমে পত্রিকার উদ্দেশ্য ও গাণিতিকগল্প সম্পর্কে জানাতে চেষ্টা করেছেন।

প্রথম সংখ্যায় গাণিতিক গল্প পত্রিকা 'ছয়' সম্পর্কে কোনো বক্তব্য না থাকলেও দ্বিতীয় সংখ্যায় (মে ১৯৮০) 'ছয় তারকা' শিরোনামে যে প্রক্ষিপ্ত বক্তব্য আছে সেগুলো হলো :

আমরা ছয় গোষ্ঠীর একজনকে হারিয়েছি
আমরা দুঃখিত, আমরা মর্মাহত।
বর্তমানে আমরা ৫+০=৬

এখন থেকে সবকিছু ছয় সংখ্যক করুন। কারণ সত্তরের দশক পর্যন্ত পাঁচ তারকা ছিল এখন ছয় তারকা। ছয় চান। ছয় নিন। ছয় বলুন। ছয় পড়ুন। ছয় পড়ান। ছয় দেখান। ছয় বানাবার কথা বলুন এবং ছয় হোন। জীবন ছয়ময় করুন। এবং অবশ্যই ছয়ময় করার আগে পাঁচময় হোন। তারও আগে চারময় তারও আগে…। নতুবা জীবন ছয়ময় করলেও আপনাকে পাঁচময়ের মতো দেখাবে, শোনাবে এবং বলাবে। ধাপে ধাপে আসুন। আমরা ধাপ বর্জন-কারীদের পুঁচিয়ে পুঁচিয়ে হত্যা করব মনস্থ করেছি।

অনেকেই স্থিতিশীল জীবন চায়, ছয় চায় না। সুতরাং যারা স্থিতিশীল জীবন চাইছেন, অথচ ছয় সেজে বসে আছেন, তাঁরা নিপাত যান। তাঁরা পাঁচময় হোন এবং পৃথিবীর ইতিহাসের পঞ্চমপৃষ্ঠায় তাঁদের স্থান হোক।

ছয়-২ পড়ার পর যদি মনে হয় আপনার শরীর অথবা মন অস্থির হয়ে পড়েছে, ওষুধ প্রয়োজন। জানবেন এর একমাত্র ওষুধ দ্বিতীয়বার ছয়—২ পড়া।

চিরঞ্জয় চক্রবর্তী প্রচারিত এই বক্তব্য অস্পষ্ট থেকে যায় পাঠকের কাছে তবু এই বক্তব্যে স্থিতিশীল অবস্থার বিরোধিতা যে করা হয়েছে তা স্পষ্ট এবং তার জন্যই 'ছয়' পড়া জরুরী।

'ছয়' পত্রিকার ৪ র্থ সংখ্যা থেকে মানস বসুর বিষয় ৬ ও অনুপ সেনগুপ্তর 'লেখক গল্প ও পাঠক' আলোচনা (আংশিক) এবং ৫ সংখ্যা থেকে চিরঞ্জয় চক্রবর্তীর 'গল্পের গাণিতিক বিভাজন' (আংশিক) তুলে দেওয়া হলো। এর থেকে গাণিতিক সাহিত্য সম্পর্কে বক্তব্যটি স্পষ্ট হবে।

"অঙ্ক শব্দটার মধ্যে ভয়ের কোন চিহ্নমাত্রই নেই। আসলে মানুষের জীবন-যাত্রার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে অঙ্ক জড়িত। (অঙ্ক মানুষকে হাতে-কলমে কোনদিনই শিখতে হয় না বরং) মানুষ জন্ম থেকেই অঙ্কের সঙ্গে আপনাআপনিই জড়িয়ে পড়ে। আধুনিক গণিতজ্ঞরা প্রায়ই একটি চিহ্ন (symbol) ব্যবহার করেন যার চেহারাটি '+' এবং অর্থ কোন পুরানো জিনিসের সঙ্গে নতুন কিছুর সংযোজন। মানব জন্মের ক্ষেত্রেও কিন্তু '+' ব্যবহার করা চলে কারণ পুরানো পৃথিবীর সঙ্গে নতুন প্রাণের সংযোজনরূপে। অনুরূপভাবে মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে আধুনিক গণিতজ্ঞের '—' চিহ্নটি একইভাবে জড়িত। জন্ম, মৃত্যু মধ্যিখানে যে একটি বিরাট জীবনযাত্রা, এর

সবটাই কোন না কোনভাবে একটা নিয়ম মেনে চলেছে। একদম ছোটবেলায় প্রথমে হাঁটি হাঁটি পা পা, তারপর অ, আ, ক, খ, ক্রমে A, B, C, D, তারপর ১, ২, ৩, ৪, ইত্যাদি সবই একটা নিয়মমাফিকভাবে আমাদের শেখানো হয়। অ-এর পর আ, A-এর পর B আমরা লিখি, কখনো শিখি না আ-এর পর অ, B-এর পর A ইত্যাদি, আধুনিক গণিতজ্ঞরা যে শ্রেণী (series) শব্দটা ব্যবহার করে থাকেন এগুলি তারই অন্তর্ভুক্ত। মনে করা যাক চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে চারজন লোক চারটি রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করলো। যদিও তারা নিজের নিজের কাজের তাগিদেই চারদিকে যাচ্ছে তবুও তাদের প্রত্যেকের হাঁটা পথগুলি অঙ্কের মাধ্যমে একই 'সমীকরণ' (Equation) দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আমরা সব সময়ই কোন না কোন নিয়ম মেনে চলেছি, সে কর্মের তাগিদেই হোক বা জৈবিক তাগিদেই হোক, (সেগুলো আমাদের জানাই থাক বা না জানাই থাক,) আর দেখা যাচ্ছে এগুলি সমস্তই অঙ্কের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

'ছয়' চায় অঙ্ক এবং সাহিত্যের মধ্যে একটা সরাসরি সম্পর্ক (direct relation)। এ ব্যাপারে 'ছয়' ছয়টি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। আর এগুলি জানতে হলে আপনার অতি অবশ্যই ছয়—১, ছয়—২, ছয়—৩ এবং ছয়—৪ অন্ততঃ পক্ষে ছয়বার করে পড়া উচিত। ছয়-এর সমস্ত লেখাই গণিত মাধ্যমে প্রস্তুত হয়। অবশ্য 'গণিত মাধ্যমে' প্রস্তুত লেখাগুলি পাঠকের উদ্দেশ্যে ছাপার আগে যেভাবে সরলীকরণ হয় তাতে অঙ্ক বিষয়ক উচ্চ জ্ঞানের প্রয়োজন থাকে না। শুধুমাত্র বার-বার পড়তে হয় এবং অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে। (বিষয়—৬। মানস বসু)।

অনুপ সেনগুপ্ত-র নিবন্ধাংশ :

'গল্প—লেখেন লেখক, পড়েন পাঠক। গল্পকে কেন্দ্র করে একদিকে লেখক অপর দিকে পাঠক। কোন পাঠক প্রকাশ্যে গল্পের সমালোচনা করে, কেউ কোন রকম প্রকাশ্য সমালোচনায় আসে না। কোন সমালোচনা হলে তাতে ধরা পড়ে গল্পের সমালোচনা আর গল্পের পরিপ্রেক্ষিত লেখকের সমালোচনা। কিন্তু গল্পকে ঘিরে শুধুমাত্র লেখক নয় পাঠকও আছে। পাঠক ছাড়া, একটা গল্পর সার্থকতা কখনও সম্পূর্ণ হয় না। গল্পের সার্থকতার পিছনে পাঠকশ্রেণীর বিরাট একটা ভূমিকা আছে, এটা একজন সমালোচক ভুলে যায়। সমালোচনার প্রসঙ্গে না গিয়ে এইটুকু বলা যেতে পারে যে এতদিন শুধুমাত্র গল্প আর তার লেখককে নিয়েই ভাবা হয়েছে, এতটুকুও ভাবা হয়নি গল্পের পাঠকদের নিয়ে। এতদিন ঘটনাটা স্বাভা-বিকভাবে ঘটে এসেছে। অর্থাৎ লেখক লিখছে এবং পাঠক পড়ছে। "লেখক—

গল্প—পাঠক" এই বিষয়টা বস্তুতঃপক্ষে একেবারেই সরল নয় বরং বেশ জটিলতার সৃষ্টি করে। কারণ :

(ক) গল্প লেখেন লেখক, পড়েন পাঠক। অর্থাৎ লেখা এবং পড়া এই দুই ব্যাপার ঘটে দুই পৃথক ব্যক্তির ক্ষেত্রে।

(খ) ভিন্ন ব্যক্তির অনুভব ক্ষমতা এবং মানসিকতা ভিন্ন ভিন্ন। অর্থাৎ একই ঘটনা ভিন্ন ব্যক্তির মনে ভিন্ন ছাঁচের অনুভূতি সৃষ্টি করে এবং সেই অনুভূতি ভিন্ন মানসিকতায় বিশ্লেষণের ফলে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাঁচের বিশ্লেষণ পাওয়া যায়।

(গ) গল্পে ধরা পড়ে লেখকের মানসিকতা। গল্পটি অনুভব করা এবং তার বিশ্লেষণে ধরা পড়ে পাঠকের মানসিকতা।

(ঘ) উল্লেখযোগ্য কারণ এই যে, লেখক লেখার সময় পাঠক সম্পর্কে অবহিত থাকেন না। লেখক চেনেন না পাঠককে, জানতে পারেন না তার মানসিকতা কি ধাঁচের। লেখক লেখেন সম্পূর্ণ নিজের মত করে।

এই বিরাট ফাঁক থাকা সত্ত্বেও লেখক লেখেন, পাঠক পড়েন। স্বাভাবিক-ভাবেই প্রশ্ন এসে যায়, লেখকের সার্থকতা কোথায়, পাঠকের সার্থকতা কোথায় ও মূল লেখাটার সার্থকতা কোথায় ?

লেখকের একটা লেখা নিয়ে ভাবা যাক। এই লেখা কোন বাস্তব ঘটনাকে কেন্দ্র করে আলোচিত হতে পারে, বাস্তবের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে আলোচনা হতে পারে, বা সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত হতে পারে।

এক্ষেত্রে লেখককে পাঠক সরাসরি গ্রহণ না করুক, কিন্তু লেখকের সার্থকতা এই যে, তিনি কোন একটা সম্বন্ধে পাঠকের মনে একটা অনুভূতির সৃষ্টি করতে পেরেছেন বা পাঠককে ভাবার সুযোগ করে দিতে পেরেছেন, অর্থাৎ পাঠকের মনে আঘাত সৃষ্টি করতে পেরেছেন। পাঠক তার লেখা নিয়ে ভাববে এবং সেই লেখার উপর ভিত্তি করে নিজের ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। পাঠকের সার্থকতা এই যে, পাঠক লেখার মাধ্যমে কোন একটা বিশেষ ঘটনা নিজের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন এবং নিজে সেই ঘটনাকে সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করে ফলটা হাতে পেয়ে গেছেন। যা পাঠকের মনে নতুন ধারণা বা নতুন অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে। গল্পের সার্থকতা এই যে, লেখক এবং পাঠক উভয়েই গল্পের আশ্রয় নিয়েছেন এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে।

লেখক———>গল্প———>পাঠক

উদাহরণ : (প্রেরক) (মাধ্যম) (গ্রাহক)

মানুষের রাগ বিষয়ে অনুপের একটা বিশেষ কৌতূহল আছে। এই রাগ সম্পর্কে অনুপ বিভিন্ন ব্যক্তির কিছু অভিমত সংগ্রহ করেছে।

১. পুরুষের রাগে পৌষমাস নারীর রাগে সর্বনাশ।
   (এক বিবাহিত নারীর অভিমত)

২, রাগ থাকা উচিত নয় (এক বাস কণ্ডাক্টরের অভিমত)

৩. রাগ থাকা উচিত (এক মধ্যবয়স্ক অধ্যাপকের অভিমত)

৪. রাগ থাকা উচিত, আয়ত্তের মধ্যে (এক চাকুরীরতা স্ত্রী লোকের অভিমত)।

অনুপের নিজস্ব অভিমত ২নং (অর্থাৎ রাগ থাকা উচিত নয়) এবং ১, ৩, ৪নং বিরোধী।

ধরা যাক অনুপ একটা গল্প লিখে ফেলল। গল্পে যদি প্রসঙ্গক্রমে রাগ বিষয়টা এসে যায়, অনুপ স্বাভাবিকভাবেই ঘটনাগুলিকে এমনভাবে সাজাতে থাকবে যার ফলে গল্পে অনুপের মানসিকতা "রাগ থাকা উচিত নয়"—এই বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই গল্পের পাঠকদের মধ্যে যারা ১, ৩ অথবা ৪নং অভিমতকারী, তারা অনুপের গল্পের ভাবধারাকে গ্রহণ করবেন না। এক্ষেত্রে পাঠক অনুপের গল্প গ্রহণ না করলেও তিনি গল্পের মাধ্যমে একটি ঘটনার সামনে উপস্থিত হবেন এবং তাঁর নিজের অভিমতের সাহায্যে ঘটনাকে বিশ্লেষণ করার সুযোগ পাবেন।

অনুপের সার্থকতা পাঠকের মনে আঘাত সৃষ্টি করায়, পাঠকের সার্থকতা ঘটনা অনুভব এবং তার বিশ্লেষণের সুযোগ পাওয়া।

ভিন্ন ব্যক্তিবিশেষে ভিন্ন মানসিকতার অস্তিত্বের ফলে "লেখক—গল্প—পাঠক" ঘটনাটিতে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ফল লক্ষ্য করা যায়, "পাঠকের শ্রেণীবিভাগ"। "পাঠকের শ্রেণীবিভাগ"কে আরও স্পষ্ট করে প্রমাণ করে গণিত মাধ্যম।

চিরঞ্জয় চক্রবর্তীর নিবন্ধাংশ :

॥ ১ ॥

সমস্ত সাহিত্যই গণিত নির্ভর কিন্তু কোন গণিতই সাহিত্য নির্ভর নয়।

গণিত কি?

গণিত অর্থে পূর্বপরিকল্পিত সূত্র বা সূত্রসমষ্টি।

॥ ২ ॥

গল্প লেখা হয় একটা সময়কে কেন্দ্র করে। সেই সময়ে পাত্র-পাত্রীর চলন-বলন, পরিবেশ এবং পরিচয় জীবন্ত হয়ে ওঠে। সময়ের দিক (Direction) সর্বদা নিম্নাভিমুখী, কারণ মানুষ ভবিষ্যতকে এক অসীম বিস্তৃত স্থান বা পরিবেশ বলে ভাবে—আমি এটা করব, এটা করতে পারলে ওই ভাবে সাজাব, সাজাতে পারলে লোককে আমি দেখাতে পারব আতিথেয়তা কাকে বলে—এগোতে থাকে অসীম পর্যন্ত। অতীতকে চেপে রাখে, স্মৃতি মনে রাখে। আকাশ আমাদের ভবিষ্যত, আমরা আকাশ চাই। আকাশের চাঁদ চাই—সূর্যের তাপ চাই। আকাশ ক্রমশঃ আমাদের দিকে নেমে আসে।

অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত আমাদের গণিতময় করে তোলে। গণিত-মানুষ তৈরী হয়। গণিত-মানুষের জীবন গাণিতিক পরিবেশে সময় কাটায়, গাণিতিক নিয়মে গণিত-মানুষ প্রজন্ম সৃষ্টি করে।

একজন মানুষের গণিত মানুষ হওয়ার পিছনে অনুশীলন করার বা নিয়মাবলী মেনে চলার প্রয়োজন নেই। রাস্তা পার হওয়ার সময় বাঁ-ডান-বাঁ পার হওয়া যাবে কিনা যে কেউ হিসাব করতে পারে, আগের বার কতটা গিয়ে লক্ষ্যবস্তু পাইনি এবং এবার কতটা গেলে পেতে পারি, এই সবই মানুষের জন্মগত গণিত জ্ঞান! গণিত মানুষদের সাহিত্য গাণিতিক সাহিত্য।

॥ ৩ ॥

গাণিতিক সাহিত্য প্রস্তুত হয় গণিত মাধ্যমে।

গণিত মাধ্যমের পর্যায়গুলি যথাক্রমে: প্রসারণগুণাঙ্ক, তাপমাত্রা, লঘুত্ব, ঘনত্ব, প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্য।...

ইন্দ্রিলা সেনগুপ্তা 'ছয়' পত্রিকার ৬ সংখ্যায় গাণিতিক গল্পের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে বলেছেন :

১. ছিল অর্থে গল্প গণিত ছাড়া হয় না। সবাই গল্প লেখার সময় অবচেতন মনে গণিতের হিসাব (নিজস্ব গল্প সম্পর্কিত) করে রাখতেন এবং গণিতের কথা না ভেবে শুধুমাত্র গল্পের কথা ভাবতেন।

২. ছিল না কারণ কেউ মনে করেন নি গল্প এবং গণিত পরস্পর পরিপূরক। গল্পের সঙ্গে গণিতের সম্পর্ক বা গণিতের মাধ্যমে গল্পের ব্যবচ্ছেদ কেউ করেননি—তাই ছিল না।

আমরা যারা গাণিতিক সাহিত্য করি বা করার চেষ্টা করছি, তারা গণিত এবং গল্প একসঙ্গে ভাবি। এবং ভাবার সময়ে আমরা উভয় বিষয়ে সচেতন থাকি। নতুবা আমাদের গল্প তৈরী হয় না।

'ছয়' পত্রিকায় লেখা থাকতো :

যাঁরা নতুন লিখছেন প্রচলিত নিয়মে ভাবছেন না, তাঁরা যোগাযোগ করুন।

গল্প / প্রবন্ধ পাঠাবার আগে সাক্ষাৎ করুন অথবা পত্রালাপ করুন।

যাঁরা অঙ্কের ছাত্র এবং সাহিত্য করেন তাঁরা যোগাযোগ করুন। আমরা আনন্দ পাব।

যাঁরা অঙ্কের ছাত্র নন অথচ অন্যভাবে ভাবছেন, তাঁরা যোগাযোগ করুন, আমরা আনন্দ পাব।

আমরা যুবক (২০-২৫) সদস্য চাই।

'ছয়' পত্রিকায় পত্রিকা গোষ্ঠীর বাইরের একমাত্র লেখক রমানাথ রায় ২ সংখ্যায় শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। এছাড়া ব্রেখটের গাণিতিক গল্প ও আইনস্টাইনের কবিতাও এরা অনুবাদ করেছেন। জানুয়ারি ১৯৮০ থেকে মে ১৯৮৩ পর্যন্ত মোট ৭টি সংখ্যা প্রকাশিত।

১০। থার্ড লিটারেচার

মুখপত্র : 'কবিপত্র প্রকাশ'—সম্পাদনা পবিত্র মুখোপাধ্যায় ও শৈবাল মিত্র। পূর্বনাম কবিপত্র। ২৫ বছরে পা দেওয়ার মুহূর্তে কবিপত্র থার্ড লিটারেচার আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করল। সাহিত্যে তৃতীয় ধারা বা স্রোত বিষয়টিকে এরা যুক্ত করলেন ইস্তাহারের মাধ্যমে। 'কবিপত্র প্রকাশ' পত্রিকার জুলাই ১৯৮৩ সংখ্যায় থার্ড লিটারেচারের গল্প সম্পর্কিত ইস্তাহার বা 'অঙ্গীকার' প্রকাশ পেল।

১. বিশুদ্ধ শিল্প শিল্পই নয়। এসময়ে বিশেষতঃ, 'বিশুদ্ধ শিল্প' সুবিধাবাদী সাহিত্য-ব্যবসায়ীর কৌশল। আমরা মনে করি আমাদের গল্প শিক্ষিত সচেতন মনে মানুষের চলতিকাল এবং আবহমানের জীবন সম্পর্কে কিছু বোধের জন্ম দেবে। আর, এই অর্থে আমরা প্রয়োগবাদী। এটি সম্ভব না করতে পারলে তা হবে ব্যর্থতা। নিছক আনন্দদানও সাহিত্যিকের কাজ নয়।

২. বস্তুবাদী দর্শন সম্পর্কে স্পষ্ট বোধ ও অপ্রয়োজনীয় ভাবাবেগ বর্জন করে। সেইবোধের আলোকে জীবনকে দেখার বৈজ্ঞানিক প্রণালী থাকবে। কিন্তু সেই-সঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন, বস্তুবাদী দর্শন—যা একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, লক্ষ্যে পৌঁছুনোর উপায়মাত্র। প্রকৃতির মতো জীবনও অনেক বড়ো ব্যাপার এবং

বিজ্ঞানের কিছু স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতা আছে। এইসব ক্ষেত্রে গল্পকার তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবেন।

৩. জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় কর্মকাণ্ডই শিল্পের বিষয় হতে পারে। আপাত দৃষ্টিতে সম্পর্কহীন, অথচ একই সময়কালে সংঘটিত বিভিন্ন ও ক্ষেত্রবিশেষে পরস্পরবিরোধী ঘটনাসমূহ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ এবং সেসবের কোন অন্তর্নিহিত যোগসূত্র আছে কিনা তা ভেবে দেখতে হবে। থাকলে, তার তাৎপর্য বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা থাকবে। এসব সহজভাবে উপস্থিত করার জন্য প্রয়োজনে বিশেষ গদ্যরীতি নির্দ্বিধায় ব্যবহার করতে হবে—অবশ্যই নন্দনতত্ত্বগত উৎকর্ষকে অস্বীকার না করে।

৪. গল্পও উদ্দেশ্যমূলক। কোন অভিজ্ঞতা-অনুভূতি পাঠকের সঙ্গে বিনিময়ের জন্য গল্প। কিন্তু যান্ত্রিকভাবে তত্ত্বের ছাঁচে জীবনকে ঢালাই করার প্রক্রিয়া, যা সেকেণ্ড লিটারেচারের মজ্জাগত, আমরা তার বিরোধিতা করছি। দ্বিতীয় সাহিত্যের ছক বা ছাঁচ আক্রান্ত লেখক প্রায়শঃই বাস্তবকে উপেক্ষা করেন, ফলত এমন এক গোলতাল কাহিনী বানিয়ে তোলেন যাতে জীবনধর্মিতা নেই। ঘটনাকে বাস্তবতার পটভূমিতে রেখে, নৈর্ব্যক্তিকভাবে উপস্থিত করতে পারার ক্ষমতা তৃতীয় সাহিত্যের গল্পকার অর্জন করতে সচেষ্ট হবেন। মনে রাখতে হবে, লেখালেখি যেমন নিছক প্রমোদসামগ্রী নয়, তেমনি শিল্পকে অস্বীকার করে সংবাদবমন বা সন্তের মতো জ্ঞান দেওয়ার উপায়ও নয়।

৫. 'গল্পের ক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় হলো লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী, তাঁর চোখের অবস্থান'—এই কথাবার্তা খুবই ধোঁয়াটে। (প্রথম ও দ্বিতীয় ধারার লেখকও বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর দাবী করে থাকেন।) থার্ড লিটারেচারের মতে, রূপদক্ষ গল্প-লেখকের ক্ষেত্রে সাহিত্যবিচারের সবচেয়ে জরুরী মাপকাঠি হল তাঁর বিষয়। দেখার দরকার লেখক আঙ্গিকের সচেতন চর্চা-র মধ্যে দিয়ে কোথায় আমাদের পৌঁছে দিচ্ছেন। কতটা গভীর তাঁর বিষয়, কতটা মৌলিক তাঁর চিন্তা ও বিশ্লেষণ। নিতান্ত অর্থহীন, ননসেন্স বিষয় নিয়ে লেখা অথচ আঙ্গিকের বিচারে উত্তীর্ণ গল্প শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য আন্দোলনে অনেক লেখা হয়েছে। আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করি। স্বাভাবিক লেখায় বিশ্বাসী বলে আমরা বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রেও আঙ্গিক ব্যবহারের মতো সমান সচেতন। আমরা মনে করি, জীবন ও ইতিহাসের মূলগত সত্য ও দ্বন্দ্বগুলি নিয়ে সাহিত্যরচনার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি। পটভূমি গ্রামের না শহরের—এ প্রশ্ন এখানে গৌণ, তা লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিধি ও অভিরুচির ওপর নির্ভর করে। কোন বিশেষ অর্থনৈতিক শ্রেণীর

মানুষের কথা লিখতেই হবে এমন বাধ্যবাধকতাও নেই, যেহেতু একটি যুগের ঐশ্বর্য ও হৃতসর্বস্বতা যে কোন শ্রেণীর মানুষের জীবনধারার মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে বলে আমরা মনে করি। তৃতীয় সাহিত্য এই বিষয়ে গল্পলেখকের ওপর কোন পূর্বশর্ত আরোপ করে না।

৬। 'আধুনিক মনন'*সমৃদ্ধ লেখাই 'আধুনিক' লেখা। থার্ড লিটারেচারে বিশ্বাসী গদ্যলেখক সর্বার্থে মননশীল হবেন এবং বিষয়সচেতন ও উদ্দেশ্যনিষ্ঠ বলেই অপ্রয়োজনে তিনি একটি শব্দও ব্যবহার করবেন না।

[সমকালীন বাংলা গল্প-উপন্যাসের ইতিহাস একটু 'গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, প্রচলিত ধারায় এই মননের অভাব কত বেশী। আধুনিক কবিতা ও সমকালীন গল্পের ইতিহাস খুব বিস্ময়করভাবে পৃথক! মননে জীবনানন্দ—সুধীন্দ্রনাথ—বিষ্ণু দে—বুদ্ধদেব বসু—অমিয় চক্রবর্তীদের পাশাপাশি ক'জন গল্পকার দাঁড়াতে পারেন ?**

পাশ্চাত্য সাহিত্যে কিন্তু এমনটা হয়নি।

বোদলেয়ার রিলকে মালার্মে এলিয়ট ইত্যাদিদের পাশে ডস্টভয়েস্কি মান কামু জয়েস্ কাফ্কারা সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত এবং ভাবনার গভীরতা বা জীবনদর্শনের বিচারে সমান গুরুত্ব দাবী করেন। বাংলা কথাসাহিত্যের এই মননহীনতার জন্য দায়ী গল্পকারদের নিছক কাহিনী বলার প্রবণতা। এইসব গোলা লেখকদের গোড়ে গোড়ে দিয়েছেন ওইসব লেখকরা যাঁরা চোখের অবস্থানের কথা বলেন! তাঁরা মূলতঃ কাহিনীকথকই, পটভূমি হয়তো আলাদা—একটু গ্রাম, চরিত্রের মুখে দু'চারটে দেহাতি কথা, ডিটেলের কিছু কাজ, একটু আবেগসর্বস্ব দারিদ্র্য, একটু দায়িত্বহীন বিদ্রোহঃ মহাজনের বাড়ী আক্রমণ—কিন্তু সেই কাহিনীই। শেষে ভাষার মোচড়ে কিছুটা ব্যঞ্জনা এনে দেওয়ার প্রচেষ্টা, যার অর্থ যে কী অনেক সময়

* 'আধুনিক মনন' কথাটিকে সংক্ষেপে এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে: লেখক যেখানে সমসময়ের প্রেক্ষিতে জীবন ও ইতিহাসের অন্তর্নিহিত সত্যগুলি উপলব্ধি করতে পারছেন।

** মানিক-সতীনাথ-জগদীশ-প্রেমেন্দ্র মিত্র ইত্যাদি এবং আগে পরে আরো কয়েকজনের লেখায় বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা দেখা গেছে, কিন্তু যৌথ উদ্যোগ তেমনভাবে দানা বাঁধেনি। সম্ভবতঃ এই কারণেই আধুনিক কবিতার মতো তার প্রভাব সমকালীন ও উত্তরকালের গদ্যকারদের ওপর অত ব্যাপক ও গভীর হয় নি।

স্পষ্ট করে লেখকও জানেন না! জিজ্ঞেস করলে গম্ভীর মুখে বলেন 'ওইখানেই তো শিল্প হে!' এই অত্যাশ্চর্য 'শিল্প' বস্তুটি যে কী বোধহয় একমাত্র শয়তানেই জানে।]

৭. বৃত্তধর্মী কাহিনী বলার প্রবণতা ত্যাগ করতে হবে। লেখক কোন ঘটনাই ঘটিয়ে তুলবেন না, যা স্বাভাবিক সেভাবেই ঘটনাকে ঘটতে দিতে হবে। আর স্বাভাবিক লেখক বলেই, গল্পকার নির্বাচন করবেন কোন স্বাভাবিক ঘটনা প্রবাহ তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করার উপযোগী। কাহিনীর নির্যাস ব্যবহার করে অথবা কাহিনীকে অলস সূত্রে রেখে বিষয়কে প্রোথিত করার বিশিষ্ট গদ্যরীতি আয়ত্ব করার প্রচেষ্টা থাকবে। নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে প্রতিদিনের বাস্তব অভিজ্ঞতা।

৮. কিছু হয়ে ওঠে না, হওয়ায় মানুষ, অর্থাৎ, নির্মিতি অর্থেই সচেতন অনুশীলন, চর্চা। আঙ্গিকও সচেতন চর্চা আর বিষয়ের মতো সমান জরুরী। এই অনুশীলনই ক্রমে গল্পকারকে খুঁজে নিতে সাহায্য করে নিজস্ব গদ্যরীতি, যা আর পাঁচজনের মধ্যে-থেকে তাকে আলাদা করে চিনিয়ে দেব। আর আঙ্গিক সম্পর্কিত ভাবনা ও ক্রমাগত চর্চা থেকেই গড়ে ওঠে শিল্পীর রূপদক্ষতা, যাকে আমরা প্রায়ই 'Craft' বলে থাকি। অবশ্য তৃতীয় সাহিত্য বিষয় ও আঙ্গিকের সম্পর্কহীনতা স্বীকার করে না, দুয়ের অপরিহার্যতা যেন লেখা পড়ে পাঠক বুঝতে পারে।

তবে এটুকু মনে রাখতে হবে আঙ্গিকচর্চা মানে অনর্থক জটিল করে তোলা আর কসরৎ নয়। প্রত্যেক যুগেরই নিজস্ব বক্তব্য আছে, থাকবে। অতএব বলার কথা বলার প্রয়োজন খুব বেশী করেই আছে, তেমনিই উপস্থাপনার কৌশলও আয়ত্ব করার দরকার। তৃতীয় সাহিত্য আঙ্গিকের ক্ষেত্রে পূর্বশর্ত আরোপ করে না।

৯. উচ্চকিত শ্লোগান এবং চমক সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে হবে। টাইপের এক্সপেরিমেণ্ট ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিশেষ করে খুবই সতর্ক হতে হবে। মনে রাখা দরকার, চমক সুঅধীতি রসজ্ঞ পাঠককে বীতশ্রদ্ধ করে তোলে—তাতে আন্দোলনের ক্ষতিই হয়।

১০. পণ্ডিত নয়, তবে থার্ড লিটারেচারের গল্পকার অতি অবশ্য বিদ্বান হবেন। বিষয় ও আঙ্গিকের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস, সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্ব, সেই সঙ্গে ভারতীয় ধর্ম-দর্শন, ভারতীয় সমাজ, আচার অনুষ্ঠান, লোকশিল্প, জীবনযাপন পদ্ধতি—এসব ভালভাবে জানার দরকার। প্রয়োজন বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর ও নিয়মিত পড়াশোনা, যা করেন এমন লেখক এই মুহূর্তে খুবই বিরল। থার্ড-লিটারেচারে বিশ্বাসী গল্পকার গবেষকের তথ্যনিষ্ঠা এবং শিল্পীর সৌন্দর্যবোধের আদর্শ সমন্বয়।

১১. একমাত্র আমিই বিরাট পড়াশুনা করি, সব বুঝি, আর আমাকে প্রশংসা না করলে পাঠক মূর্খ বা যথেষ্ট আধুনিক নন—এই জাতীয় মনোভাব পরিত্যাগ করতে হবে। মনে রাখা প্রযোজন, যে দেশের মানুষের মজ্জার গভীরে লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য, তাঁদের রসবোধ যথেষ্ট উঁচু মানের। পাঠক বোকা নন।

১২, গল্পের বিষয় যেখানে জটিল, সেখানে গল্প স্বাভাবিকভাবেই জটিল হবে। জীবনের সহজবোধ্য মানে-বই রচনা আমাদের কাজ নয়—পাঠককেও তৈরি হতে হবে।

[থার্ড-লিটারেচার কবিতার ইস্তাহারের সঙ্গে এইখানে আমাদের স্পষ্ট মতভেদ রয়েছে। আধুনিক কবিতা ও গল্পের ইতিহাস এক নয়; তাই এই দুই পৃথক শিল্পরূপের ক্ষেত্রে সব ভাবনাই যে একরকম হতে হবে—এমন ভাবারও কোন কারণ নেই। সরল করতে গেলে জোলো কাহিনী মাত্র লিখতে হয় আমরা তার বিরোধী। এতে কোরে এই আন্দোলনের মূল ঘোষণার কোন বিরোধিতা করা হয় না—কেননা তৃতীয় সাহিত্য আসলে একটি বিশেষ দর্শনের আলোকে সৃজনশীল শিল্পকর্ম। সরলতা, জটিলতা পরের কথা। তাছাড়া, এখন যখন সমকালীন সাহিত্য মননহীন নির্বোধ গোলা লেখকের আড্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সরলীকরণের চেষ্টা চললে তা প্রতিবাদী কথাসাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি করবে বলে আমরা মনে করি।]

১৩. সামাজিক সমস্যার শ্লেষ ও আবেগসর্বস্ব শিল্পরূপ মূল্যহীন। শিকড়বিহীন দার্শনিকতা আসলে একধরনের কলাকৈবল্য। [থার্ড-লিটারেচার পূর্ববর্তী দশকগুলির পরীক্ষানিরীক্ষায় ব্যস্ত 'ভিন্ন গল্পকারদের' এবং অন্যরকম লেখার প্রয়োজনে সংগঠিত সাহিত্য-আন্দোলনগুলিকে শ্রদ্ধা করে এবং আলোচনা ও মূল্যায়ণের মধ্যে দিয়ে তা থেকে সমৃদ্ধ হতে চায়। ('অন্যরকম', 'ভিন্ন'—শব্দগুলি বোঝাচ্ছে সেইসব গল্প, যেখানে জীবনের সত্য উন্মোচনের ক্ষেত্রে লেখকের সচেতন প্রয়াস লক্ষিত হয়েছে, যেখানে লেখক পাঠককে ঘুম পাডানোর দায়িত্ব নেন না।)] গত তিন দশকের ভিন্ন গল্পের পর্যালোচনা করলে সেগুলিকে মূলতঃ দু'টি শ্রেণীতে * বিভক্ত করা যায় :

* মজার ব্যাপার, আমরা বিশ্লেষণ করে দেখেছি এমন গল্পকার প্রায় নেই যিনি এই দু'ধারাকে কোনভাবে মিলিয়েছেন। এই দু'ধারার লেখকরা কেন জানি না, একে অন্যধারাকে তীব্র আক্রমণ করে থাকেন এবং নিজে সঠিক ধারার সাহিত্যিক বলে দাবী করেন!

ক. সমাজ-ভিত্তিক গল্প :—এখানে গল্পকারের বিষয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ (বিশেষতঃ দরিদ্র মানুষ) তাদের জীবন-ধারণের সমস্যা, সামাজিক সমস্যা ও শোষণ, রাজনীতি ইত্যাদি। এই ধারার সব লেখক-ই সচেতন বা অসচেতন-ভাবে সেকেণ্ড লিটারেচার করেছেন। তাঁদের লেখায় সামাজিক সমস্যার যুক্তি-নির্ভর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অপেক্ষা আবেগ এবং শ্লেষের প্রাধান্য-ই বেশী। আর, লেখায় প্রভূত পরিমাণে 'দরিদ্রনারায়ণের কথা বললেও, ব্যক্তিগত জীবনে লেখক নিজেও যে কত অসহায়, নিরুপায় এবং তিনিও যে শোষণের মধ্যে দিয়েই বেঁচে থাকেন'—এই সত্য প্রায়ই অস্বীকৃত, অনুচ্চারিত তো বটেই।

থার্ড লিটারেচার সমাজ-ভিত্তিক গল্পের ক্ষেত্রে দাবী করে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, শ্লেষ বা আবেগ নয়। প্রতিবছর-ই 'এ দুর্ভাগ্য দেশে' খরা-বন্যা হয় এবং ঠিক তার পরেই সমকালীন সাহিত্যে এসব নিয়ে লেখার জোয়ার আসে। বলা বাহুল্য, এতে না হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঠেকানোর উপযুক্ত ব্যবস্থা না হয় মূল্যবোধের কোন পরি-বর্তন। অথচ চোখ দিয়ে পাঠকের জল গড়ায়—সেন্টিমেন্টের ব্যাপার প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তো কোন না কোন জায়গায় রয়েছে!

থার্ড-লিটারেচার এই সামাজিক সমস্যাগুলির অনেক গভীর বিশ্লেষণ করবে। লেখক অর্থনৈতিক মূল্যমান, শ্রম ও উৎপাদনের সম্পর্ক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কুফল, অবক্ষয় ও মূল্যবোধহীনতা এবং এই সময়—এসব গভীরভাবে ভাববেন এবং প্রয়োগবাদীর কৌশলে তা উপস্থিত করবেন শিল্পরূপকে অস্বীকার না করে।

খ. মনস্তাত্ত্বিক ও দর্শননির্ভর গল্প : —এই ধারার লেখকদের প্রিয় বিষয় আজকের ও সর্বকালের মানুষের জটিল মানসিক সমস্যাসঞ্জাত দ্বন্দ্ব ; উপলব্ধি অনু-ভূতির বিচিত্র রহস্যময় জগৎ ; জীবনের তাৎপর্য বিষয়ে জরুরী দার্শনিক ভাবনা-সমূহ ; অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব সংক্রান্ত ভাবনা ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম অবশ্য-ই আছে, তবে এ ধারার লেখকের গল্প যতটা ব্যক্তিগত ততটা নৈর্ব্যক্তিক নয় অনেকক্ষেত্রেই (যেমন, শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য)। একজন ব্যক্তির সমস্যা, তা যদি ব্যক্তিগত সমস্যা হয়েই থাকে, যদি তা গল্পকারের লেখনীতে এমন কোন মাত্রা না পায় যা সর্বমানুষের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য—তবে তা পাঠককে ভাবাবে কেন ? তাছাড়া, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইসব গল্পকারদের সৃষ্ট চরিত্রগুলি মাটিতে পা রেখে চলে না—গল্প পড়ে মনেই হয় না চরিত্রগুলি এই পৃথিবীতে বাস করে, প্রতিদিনের জীবনযাপনের খুঁটিনাটি তাদেরও সামলাতে হয়।

আবার একদল তথাকথিত বস্তুবাদী (বস্তুত মূর্খ ও নির্বোধ) রয়েছেন যারা মনে করেন প্রত্যেক গল্পে শ্রেণীসংগ্রাম না দেখালে প্রগতি সাহিত্য হল না, বা অর্থনৈতিক সমস্যার তুলনায় ব্যক্তির যাবতীয় দর্শনচিন্তা ও বুদ্ধিদীপ্তি অপ্রয়োজনীয়, মূল্যহীন! এরাও আসলে একধরণের রঙিন রোমান্টিকতায় ভোগেন। যাকে সকালে বাজার যেতে হয়, কেরোসিন তেলের লাইন দিতে হয়, এই জঘন্য পরিবহন ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে কর্মস্থলে যেতে হয়—তার জীবন সম্পর্কে কোন ভাবনা, বা অস্তিত্ব বিষয়ক উপলব্ধি থাকতে পারে না, বা থাকলে 'কমিট্‌মেণ্ট' থাকে না—এ বড় অদ্ভুত কথা! এইসব লোকের অধিকাংশেরই জানা নেই বা থাকলেও বিশেষ কারণে ভুলে থাকতে চান (রাজনৈতিক দলের আনুগত্য হারানোর ভয়ে? না কি নিজের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে?—জানি না!) বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে সার্ত্রের গভীর আলোচনা রয়েছে এবং বস্তুবাদ পাভলভ, ও অংশতঃ ফ্রয়েডকে স্বীকার করে এবং চিন্তাপদ্ধতি ও মানবমনস্তত্ত্ব সম্পর্কে আরো বস্তুনিষ্ঠ গণিত নির্ভর জ্ঞানের প্রয়োজনে সাম্প্রতিককালের জীব-পদার্থবিদ্যা (Bi-ophysics) ও জীবরসায়নের (Bio-chemistry) নতুন নতুন গবেষণা ও আবিষ্কারকে স্বাগত জানায়। মানুষের যাবতীয় অনুভূতি উপলব্ধিই বাস্তব সত্য, যেহেতু তা মস্তিষ্কে জটিল জৈবরাসায়নিক (বস্তুবাদ স্বীকৃত) প্রক্রিয়ার ফলেই জন্ম নেয়। প্রকৃত বস্তুবাদী এসব অস্বীকার তো করেন নাই-ই, বরং এগুলি তাঁর গভীর মনোযোগ দাবী করে।

(প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, যদিও কেবল স্বপ্নচিন্তা ও অবচেতনের তত্ত্বই সুররিয়্যালিজম্ নয়, তবুও মূলতঃ ফ্রয়েডীয় দৃষ্টির আলোকে মোড়া 'অতিবাস্তববাদ'কে আমরা অধঃবাস্তববাদ বলে মনে করি যেহেতু তা অযৌক্তিক এবং লেখকের তিনসত্যের কোন মূল্য এই ভাবনায় স্বীকৃত হয় না। তবে নতুন কিছু করার প্রবণতা হিসেবে এই আন্দোলন অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। আমাদের মনে হয়, সুররিয়্যালিজমের শিকড়সন্ধান যদি তৎকালীন ইউরোপের ক্ষয়িষ্ণু অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে করা হয় তবে হয়ত একটা প্রেক্ষাপট পাওয়া যেতে পারে।)

তৃতীয় সাহিত্যে বিশ্বাসী লেখকের বিষয় মনস্তত্ত্ব হবে কিনা, বা তাঁর লেখায় দর্শন কতটা কিভাবে থাকবে, তা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার; কিন্তু তাঁর সৃষ্ট চরিত্রে অতি অবশ্য-ই বাস্তবতা থাকবে।

অবশ্য চারপাশের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঘটনা ইত্যাদি সোজাসুজি বলে যাওয়াটাই সবসময়ে বাস্তবতা নয়, তা 'অ্যাবস্ট্রাকশান্'-এর মাত্রা নিয়েও আসতে

পারে। লেনিন তাঁর 'Empirio-criticism'-এ এগুলিকে বাস্তবেরই কিছু 'রূপান্তরিত উপরিস্তর' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

বিশেষতঃ মনস্তাত্ত্বিক অথবা দর্শননির্ভর গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমাদের ভাবনার ভিত্তিতে যদি 'Stream of Consciousness Methoo' ব্যবহার করা যায় তবে হয়ত উল্লেখযোগ্য ফল মিলতে পারে! স্মরণ করা যেতে পারে, ৭নং অঙ্গীকারে কাহিনীকে অলসসূত্রে রেখে বিষয়কে প্রোথিত করার উপযোগী গদ্যরীতি ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। ষাটদশকে 'কবিপত্র' যে ধ্বংসকালীন কবিতা আন্দোলন শুরু করেছিল তা ক্ষণস্থায়ী হলেও, তার ভাবনায় প্রভাবিত হয়েছিলেন সমকালীন কোন কোন গল্পকার। সে সময়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য এবং প্রায় অপঠিত গল্প-উপন্যাস এই পদ্ধতিতে রচিত হয়েছিল। যথাসময়ে আমরা সেগুলির সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা প্রকাশ করব।

১৪. থার্ড-লিটারেচারে বিশ্বাসী লেখকের গল্প লেখার সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু জরুরী অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব আছে। পঞ্চাশ-ষাট-সত্তরের অধিকাংশ প্রতিভাবান ভিন্ন গল্পকার এখনো প্রায় অপঠিত-ই। অনেক স্বেদ-রক্তের বিনিময়ে এঁরা যে সোপান গড়েছেন, তার ওপর দাঁড়িয়েই আজ থার্ড লিটারেচারের ঘোষণা সম্ভব হচ্ছে। আমাদের কাজ হবে প্রবন্ধে, আলোচনায়, পুস্তক সমালোচনায় এমনকি আলাপ আড্ডার মধ্যে দিয়েও সাধারণ পাঠককে সুযোগ পেলেই পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলা। গোলা-লেখকদের, প্রয়োজনে ব্যক্তিবিশেষের নামোল্লেখ করেও, চিনিয়ে দিতে হবে।

পরিশিষ্ট ১

কবিতা-গল্প আন্দোলনভিত্তিক কবিতা ও গল্পাংশের কিছু নির্বাচিত নমুনা

ক. শ্রুতি কবিতা ১

কটা পকেট পকেটগড়ের মাঠ মাঠ খেলা ইস্টবেঙ্গলমোহনবাগান
চুনীগোস্বামী ষড়গোস্বামী বৃন্দাবন কৃষ্ণ কৃষ্ণদাসকবিরাজ কবিরাজ
কবিরাজী স্বর্ণসিঁদুর সিঁদুর সিঁন্দুরকৌটো প্রজাপতি বিয়ে কারবিয়ে
নেমন্তন্ন ওঁকেআরোএকটুদই দই গাঙ্গুরাম রাম রঘুপতিরাঘব রাঘব
আমিকিডরাইসথিভিখারীরাঘবে প্রমীলা ইন্দ্রজিৎ রামায়ণ মহাভারত
ভারত ভারতআবারজগৎসভায় সভা মনুমেণ্টেরনিচে বন্ধুগণ আমরা
আজ আজ কাল কাল রোববার রোববার ছুটি আড্ডা রাসবিহারী
রাসবিহারী হাইকোর্ট কোর্ট ধর্মাবতার জবানবন্দী কমলাকান্ত বংকিম
কপালকুণ্ডলা পথিকতুমিপথহারাইয়াছনবকুমারকর্ণে নবকুমার
উত্তমকুমার উত্তরাউজ্জলাপূরবী ৩টে৬টা৯টা লাইন টিকিট পয়সা
পকেট দুপাশে দুটো বুকে একটা ভেতরে

(পুষ্কর দাশগুপ্ত)

শ্রুতি কবিতা ২

চোখ গেল
জল কর
চোখ গেল
জল কর
চোখ গেল
চোখ গেল
চোখ গেল
হাতে হাত
রামে রাম
দুয়ে দুই
ট্রাম বাস
মুখ মুখ
পথ পথ
চোখ গেল
চোখ গেল

(পরেশ মণ্ডল)

খ. হাংরি গদ্য ১

এইখানে সুকুমারের মাংস পাওয়া যায়। সামনে আরও একটা 'এইখানে চম্পার মাংস পাওয়া যায়' আচ্ছন্নের মতো চোখ মেলে তাকাই : দড়িতে ঝুলতে থাকা ছালছাড়ানো মানুষগুলি এইবার আঙুল দিয়ে চোখের উপর থেকে জমাট বাঁধা রক্ত মুছে নেয়। জিভ বার করে নিজেদের শরীর বেয়ে গড়িয়ে পড়া রক্ত চেটে খায়। তারপর সকলে একযোগে আমার দিকে খলখল করে হেসে ওঠে। সম্মিলিত কণ্ঠের সেই ভৌতিক হাসি, অলৌকিক অট্টহাসি সমস্ত বাজারের দেয়ালে দেয়ালে খান খান হয়ে ভেঙে পড়ে। আর থাকতে পারি না আমি। শরীরের সমস্ত নালী-প্রণালী যেন পাক দিয়ে ওঠে। চোখের সামনে সমস্ত দোকানঘর বোঁ বোঁ করে ঘুরতে থাকে। সব আলো অন্ধকার হয়ে নেমে আসে চকিতে : শেষবারের মতো সামলাবার চেষ্টা করি নিজেকে। কিন্তু পারি না। বিয়ে বাড়িতে যা খেয়েছিলাম সব গলগল করে বেরিয়ে আসতে থাকে। ওয়াক ওয়াক শব্দ তুলে আসি বমি করে যাই, বমি করে যাই রক্তাক্ত পথের উপরে। সমস্ত চর্বিত মাংসের টুকরো, সমস্ত জীবনভোর ধরে খেয়ে যাওয়া যাবতীয় মাংসের টুকরো আমি বমি করে উগরে বার করতে থাকি। বমির তোড়ে আমার নিঃশ্বাস যেন আটকে আসে। আমি বমি করি।

[বমন রহস্য (অংশ) / বাসুদেব দাশগুপ্ত]

হাংরি গদ্য ২

রাণীর লগে মেলা দিন বাদে সাখখাৎ, শিয়ালদা ইষ্টিশন লাগ উই খাড়াইয়া, বাসের লাইগ্যা উচপুচ করতাছিলো। দেহন-মন্তরে আমারে চিকখের পাড়ছে পিছম দিয়া। ফিরা দেহি রাণী—হেই কবে শ্যাষ দেহা হইছিলো দুই বচ্ছর আগে উই হেরপর চইল্যা গেছে মর্দের লাগ, আমিও কুনো খোঁজ-খবর লইনাই আর। পিছমে কান্ধের উপরে গলার হাড্ডির ফাঁকে হাত পড়তেই চইমকা উঠছি আদখা শরীল ব্যাইয়া কনকনানি লোড পাড়ছে, কাঁটা দিয়া উঠছে। দইহ্যা আশ্চিয্যি হই, জিগাই—'তুমি? কবে এলে?' উই হাসতে হাসতে জব দ্যায় : 'গেলো হফতায়! বাব্বা, তুমি দেখছি সেইরকমই হাঁটো এখনও! মাথা নিচু ঝুঁকিয়ে বেখেয়ালী—আমি প্রথমটা ভাবলুম, বুঝি দেখেছো, ওমা—তারপর সোজা এগিয়ে যেতে কথা আর শ্যাষ করে না, মুহের দিশায় চ্যায়া হাসে। আমি খেয়ালী থাইক্যা আর হাসি ফিরৎ দিই।

[ভোগলামি (অংশ) / সুবিমল বসাক]

হাংরি গদ্য ৩

কালো ভ্যান ছুটতে ছুটতে হঠাৎ ব্রেক কষে। ওরা দু-তিন জন আমাকে চোখ বাঁধা অবস্থায় ভ্যান থেকে নামিয়ে দেয়। গেট দরাম করে বন্ধ হয়ে গেলে ভ্যান স্টার্ট দেয় আবারো। চোখ থেকে কালো ফিতের বাঁধন টেনে হিঁচরে খুলে ফেলি। গলায় ঝুলে পড়ে কালো ফাঁস। প্রথম, চোখ খুলেই. চারদিক ঝাপসা দেখি। চোখ মুছে নিই হাতের চেটোয় বারবার। যান-জনমানব কিছুই লক্ষ্যে আসে না। দক্ষিণে ২/৪ পা এগিয়ে গেলে দূরে একজন লোক চোখে পড়ে। লোকটি সামনের দিকে কোমড় ভাঙা অবস্থায় বারবার একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে কি যেন খোঁজে। লোকটি গভীর মনোযোগে আবছা অন্ধকারে খুঁজতে থাকে। লোকটির সঙ্গে কথা বলব বলে পা বাড়াই। পেছনে কি যেন উর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে যায় সড়্সড়্ করে। তাকিয়েই দেখি, দু তিনটে লেন বাই-লেন তাড়া খাওয়া পাখি হরিণীর মত ছুটে যায়। কিছুতেই বুঝতে পারি না। ছুটে যায় গলি, লেন, বাই লেন, রেড রোড রাসমণি রোডের দিকে।

[রেড রোড (অংশ) / সুভাষ ঘোষ]

গ. প্রকল্পনা সর্বাংগীন কবিতা ১

● < এনিয়ে দ্বিতীয় পুনরুক্তি হলো

এখনই

ভ্রমরাভিষেক হতে পারে→যদি—

পর্ণে নিমন্ত্রণ আছে—আসায়—

↓

গন্ধর্ব বায়ুতে ফেরে←→

↑

মুহূর্তে মুহূর্তে ফেরী হয়

বয়স্কতা—

পৃথিবীর তাবৎ বাজারে ওৎ পেতে থাকে

অভিজ্ঞ ফোড়ের চোখ ◠ ◠

শুধু চোখে

দর ওঠে দর নেমে যায়—

যে জানে

শরীর পেতে তুলে নেয় প্রেম।

[যে জানে শরীর / উত্তম বসু]

প্রকল্পনা সর্বাংগীন কবিতা

যুগ যুগ জিও

যুগ যুগ জিও যুগ যুগ জিও

[লাবডুপলাবডুপলাবডুপলাবডুপলাবডুপলাবডুপ…]

বৈভব	শুধু	বাড়তেই	থাকবে
যক্ষ	তার	পাহারায়	”
ভক্ষক	ভক্ষন	কর্তেই	”
রক্ষক	রক্ষণ	”	”
অভাবী	শুধু	ভাবিতেই	থাকিবে
দর্শক	”	দেখিতেই	”
এ্যাইও	উজবুক	চুপচাপ	থাকবে
আগুন	নিয়ে	খেল্লেই	মরবে
তবেই	না সব	চলছে	চলবে

[লাবডুপলাবডুপলাবডুপলাবডুপলাবডুপলাবডুপ…]

চারণ দল শুধু গাহিতেই থাকিবে :

হবুচন্দ্র→যুগ যুগ জিও, যুগ যুগ জিও

[লাবডুপলাবডুপলাবডুপলাবডুপলাবডুপ…]

গবুচন্দ্র→যুগ যুগ জিও, যুগ বুগ জিও

[লাবডুপলাবডুপলাবডুপলাবডুপলাবডুপ…]

সাট্টা খেলো ঘোড়া ধরো

পরী দেখো দারু পিও

পিও পিও ছুপ ছুপ পিও পিও পিও চুক চুক পিও

যুগ যুগ জিও যুগ যুগ জিও

[যুগ যুগ জিও / ভট্টাচার্য চন্দন]

ঘ. শাস্ত্র বিরোধী গদ্য-১

শুধু ডিম নিয়েই আমাদের একটা আলোচনা হওয়া দরকার।—হ্যাঁ আলোচনা দরকার।—হ্যাঁ আলোচনা দরকার।—না দরকার নেই—কেন দরকার নেই ?—দরকার আছে।…

হাতুড়ি ঠোকার শব্দ হল। কাঠের হাতুড়ি। ভাঁড় রাখার শব্দ হল। মাটির ভাঁড়। চা উপচে পড়ল। গরম চা। দেশলাই বাক্স পড়ে আছে। পোড়া কাঠি।

শুধু ডিম

—ডিম

—ডিম ডিম ডিম ডিম ডিম ডিম ডিম ডিম…

—আলোচনা হক

—ডিম ডিম রবে

সাঁওতাল পল্লীতে উৎসব হবে।—সাঁওতাল পল্লী না তো।—সাঁওতাল পরগণা—না চব্বিশ পরগণা—চব্বিশ পরগণা?—চব্বিশ পরগণা নয়ত। সুন্দরবন—সুন্দরবন। সুন্দরবনে অনেক হাঁস।

—অনেক হাঁস আর অনেক হাঁসের ডিম। এত ডিম তবু কম পড়ল।

—ডিম কেন আধখানা করা হল? আমাদের কি ডিম কম পড়েছিল?

—যদি কম পড়ে থাকে তবে টোটাল মিস্‌ম্যানেজমেণ্ট।…

[ডিম / (অংশ) বলরাম বসাক]

শাস্ত্র বিরোধী গদ্য ২

খাট, খাটের ওপর ক। চেয়ার, চেয়ারের ওপর খ। আলনা, আলনার সামনে গ। আরসি, আরসির পাশে ঘ। দেরাজ, দেরাজের সামনে চ। র‍্যাক, র‍্যাকের পাশে ছ। খাট, খাটের ওপর তোশক তোশকের ওপর চাদর চাদরের ওপর বালিশ বালিশের পাশে কম্বল কম্বলের ওপর মশারি। খাট, খাটের ওপর ক। চেয়ার, চেয়ারের ওপর খ, খ যেন মাথা নাড়ল, ক উঠে বসতে চাইল, খাট ছিল খাট আছে তোশক ছিল তোশক আছে চাদর দিল চাদর আছে বালিশ ছিল বালিশ আছে কম্বল ছিল কম্বল আছে মশারি ছিল মশারি আছে খাট ছিল তোশক নেই তোশক আছে চাদর নেই চাদর আছে বালিশ নেই বালিশ আছে কম্বল নেই কম্বল আছে মশারি নেই…খাট, খাটের ওপর ক। আলনা, আলনার সামনে গ, গ যেন হাত নাড়ল, ক দাঁড়াতে চাইল, খাট ছিল তোষক কই তোশক ছিল চাদর কই চাদর ছিল বালিশ কই বালিশ ছিল কম্বল কই খাট ছিল তোষক নেই তোষক আছে চাদর নেই চাদর আছে বালিশ নেই, বালিশ আছে কম্বল নেই… খাট, খাটের ওপর ক।…

[নাম পাচ্ছি না (অংশ) / অমল চন্দ]

ঙ. হাংরি কবিতা

মা তোমার গর্ভের চেয়ে সাংঘাতিক মনে হচ্ছে সভ্যতা ও ব্লাস্টফার্নেস। ৮২ বর্গমাইল বালুর মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আছি, সময় চেতনাহীন পরস্পরের শরীর থেকে শুষে নিচ্ছে সার পদার্থ, কোন অভিযোগ নাই শয়তান গলা পর্যন্ত টিপে ধরবে—আমার ১৬", ১৬"—এই অবস্থায় আমি ভালো মানুষের মতো বেঁচে থাকায় লিপ্ত হতে চাই, নিজেকে ঠকাতে চাই খুব—

[অংশ / প্রদীপ চৌধুরী]

হাংরি কবিতা ২

তোমাকে দেখেছি আমি স্বনির্বাচিত স্নানের ঘরে
মনে হয় মানুষের মধ্যে থেকে আমাকে তুমি জন্মপ্রণালী শেখাবে
এই অপেক্ষা আমার যেখানে একেবারে
নির্বাসিতের চেয়েও দূরে আমি আজ তোমারই কাছে ফিরে যেতে চাই

প্রথম অংশ

তুমি আর সেরকম নিরপেক্ষ নও
কেননা—জননক্ষমতা এবং রক্ত পিপাসা বুঝে ফেলেছ
আর প্রণয়ের দিনে পুরুষের মাংসের ভিতরে কথা ব'লে
তোমাকেই আবিষ্কার
তোমারই গর্ভের ছেলে কথা বলে তোমাকেই আবিষ্কার
জাহাজের মাথায় উঠে যায় নিশান ছাড়ার সময় বোঝা যায়
সে বালিকা আর নও তুমি
বাগানের পাশে ছলছুতায় মানুষের যাতায়াত
কড়া নজরে দেখবে তোমার বাবা, দরকার হ'লে
তোমাকেই আবিষ্কার

[জন্মনিয়ন্ত্রণ (অংশ) / শৈলেশ্বর ঘোষ]

চ. নিম গদ্য ১

...'আমার কাছে একটা পয়সাও নেই। পায়জামার মুহুরিতে তেলকালির দগদগে ছাপ, হাওয়াই চপ্পলের ফিতে দুটো তার দিয়ে বাঁধা।...

…বাঁদরওয়ালা পয়সা কুড়োচ্ছিল।…

…আমি বিড়িটা বাঁদরটার গায়ে ছুড়ে মারলাম। বাঁদর হাত বাড়িয়ে বিড়িটা কুড়োল। দু'হাত দিয়ে বিড়িটা ছিঁড়ল নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ নিল। জিভে ঠেকিয়ে স্বাদ নিল, তারপর দাঁতমুখ ভেংচিয়ে আমার দিকে বিড়িটা ছুঁড়ে দিল…'

—তারপর বাঁদরের পোঁদে সজোরে একলাথি কষিয়ে আমি হনহন করে হাঁটতে লাগলাম।

[মানুষ মর্কটমচ্ছব (অংশ) / মৃণাল বণিক]

নিম গদ্য ২

…'ত্বরিতে অম্বর অহনা নভমণ্ডলের নীচে চলে এলো। অনতিদূরে রাজ্যের চেলাকাঠ। তার ওপর ছিটকে পড়া ব্যাঙের ছাতার মতন জীর্ণ চট, পাশে শুয়ে অলস শরীর তিনটে কুকুর—পলকে চতুর, পলকে দ্রাঢ়িষ্ঠ, এদের দশানাই দুধেল চাঁচি শরীর। অম্বরের পায়ের আওয়াজ পেয়ে মুখ বুকের কাছে আনল, চোয়াল ফাঁক করল, এবং উরুর মধ্যে দাবনা মেরে লিংগ চাটল—কারণ, ডগডগা নরম মাংস দেখা গেল, মন্দনীল চোখ এবং দেহটা অবিকল অশ্বিনী গোল।'…

[নাভিকুণ্ড ঘিরে (উপন্যাসাংশ) / রবীন্দ্র গুহ]

নিম গদ্য ৩

'এইসব দেখতে দেখতে তার মাথার ভেতরটা উহুনে চড়ান হাঁড়ির মত টগবগ করে ফুটতে লাগলো। রাগ এবং বিস্ময়ে সে ডিগবাজি খেতে সুরু করলো। উত্তেজনা ক্রমশই বাড়ছে। সে বুঝতে পারলো এ সমস্তই অন্যায় হচ্ছে! ভীষণ অন্যায়! হঠাৎ এই সীমানা ভাঙ্গা ব্যাপার স্যাপার দেখে সে ভাবতে লাগলো সে এখন কি করবে—তার এখন কি করা উচিত।

ভাবতে ভাবতে সে ছ'তলা বাড়ির রেলিং টপকে ভেসে ভেসে নামতে লাগলো এখানে ওখানে ভীত ক্রুদ্ধ ছোটখাট মানুষের জটলা। কিছু কিছু মেটে রঙের মানুষ নিজেদের আসল মুণ্ডু বহাল রাখার ব্যাপারে কথাবার্তা চালাচ্ছিল আর ক্ষুব্ধ হাত পা ছুঁড়ছিল।'…

[ফসিলের (জারজ রোষ ও / বাতিহীন সভাঘর) (অংশ) / বিমান চট্টোপাধ্যায়]

ছ. ধ্বংসকালীন কবিতা ১

আমি মেফিসটোফেলিস পিঠে অক্সিজেন সিলিণ্ডার ঝুলিয়ে
অন্ধকারের জরায়ু থেকে লাফিয়ে পড়েছি এই সুসভ্য হারেমে
সুসভ্য হারেমে শুধু শূন্যতার হাহাকার
চতুর্দিকে আর্তনাদে খসে পড়ছে নক্ষত্রের শীতল শরীর
বীভৎস জ্যোৎস্নায় কারা হরিধ্বনি দ্যায়
কারা যেন কবরে কবরে ভিড় করে
প্রেতাত্মার পাশাপাশি আমি হাঁটি সুড়ঙ্গের পথে

[আমি মেফিসটোফেলিস শয়তানের দূত (অংশ) / প্রভাত চৌধুরী]

ধ্বংসকালীন কবিতা ২

প্রচণ্ড কম্পনে
নিভে যায় পৃথিবীর
                    বুকের মশাল

লণ্ডভণ্ড পাঁজরের হাড়
তীরবিদ্ধ কণ্ঠনালীর
বীভৎস চীৎকার
বাতাসের গলা থেকে ঝরে
ইথারের ধমনীতে কম্পিত বিদ্যুৎ
দিশেহারা হ'য়ে পড়ে।

প্রচণ্ড কম্পনে
ধ্বস নামা পৃথিবীর
                    বিধ্বস্ত কঙ্কাল
খুলে দেয় পাতালের সকল কপাট
ছুটে আসে কাতারে কাতারে
গর্ত থেকে উত্থিত কয়লার মতো
                    অসংখ্য ময়াল
গলিত শবের গন্ধে প্লাবিত ব্রহ্মাণ্ড

দারুণ ধিক্কার দিয়ে মিথ্যা বিধাতারে
আশ্রয় খুঁজে চলে শকুনীর মাথার ভিতরে
[প্রচণ্ড কম্পনে (অংশ) / সুকোমল রায়চৌধুরী]

জ. ঘটনা প্রধান গদ্য ১

ওরা খাখ্‌ খাখ্‌ খা ক'রে হাস্তে লাগলো। হাসির দমকে চোখ হয়ে গেলো বড় বড়। হাতগুলো এলো এগিয়ে। দাঁত পড়ল বেরিয়ে। জিব দিয়ে লালা ঝরলো। ঝরতে ঝরতে দেহের সমস্ত লোম ভিজে সপ্‌ সপ্‌ হয়ে গেলো। তখন ও' ভয় পেলো। কেঁপে উঠলো। চিৎকার করতে থাকলো। এবং কাঁপতে কাঁপতে আর পিছোতে পিছোতে সূর্য্যের গায়ে একটা একটা ফেট্টুন ঝুলতে লাগলো। ফলে আলোটা বনে গেলো কুয়াশার মত রোগা। রোগা হতেই ভয়ানক ধূসরতা নেমে এলো। ও তখন এগিয়ে চল্লো মুক্ত অঞ্চলে। দূর থেকে ও অনেক কিছুই দেখলো। নিষ্পাপ সবুজ হয়ে সব হাট্‌খোলা করে তরবারির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন বা আহ্বান করছে।

[ও, ওরা (অংশ) / অচিন্ত্যকুমার সাঁতরা]

ঘটনা প্রধান গদ্য ২

ছেলেটি ভীষণ দুর্বল, এবং শীর্ণ। একদিন জিজ্ঞেস করলাম—তুমি কি খুঁজছ?

ও বলল—খুঁজছি না দেখছি—

—কাকে দেখছ।

—নিজেকে

—তার মানে?

—আমি তো মাটিতে নিজেকে দেখতে পাই। এখানে আসবার সময় নিজের মুখ দেখতে দেখতে আসি

—কিছু দেখতে পাও?

—হ্যাঁ। অনেক কিছু…আমি আর বেশী দিন বাঁচব না

—কেন? কি অসুখ তোমার? মুখ থেকে হাওয়ার মধ্যে কথাটা খসে পড়ল হঠাৎ!

তাকিয়ে দেখলাম পাশাপাশি কেউ নেই। সব শূন্য! কিছু নেই…

সেই গলিটা। সেই লাল চিতা-টা। সেই বটগাছটা; বটগাছে বাঁধা ষাঁড়-টা সেই ছেলেটাও!

... ...

চিতা-এখন ঠাণ্ডা হয়েছে॥

[এক দুই তিন ক্রমশ: (অংশ) / সুভাষ গুহ রায়]

ঝ. গল্পতন্ত্র ও চাকর সাহিত্য বিরোধী গদ্য ১

সাবেক লোকে এ জিনিষ খেতো না। —নাকি নোস্তা লাগে, নাকি পানসে লাগে, নাকি ঝাঁজ লাগে। আজকাল বেশ আক্রা। এক থাবা দুটাকা। এক থাবা তুলে নিয়ে চুকচুক করে খেলাম। কলিম রসের মতো দানা-দানা। চাটতে জিভের পরিশ্রম নেই। ঠোঁট একবার কোঁচকাও, ঠোঁট একবার চিতোও, ব্যাস। প্রমীলার কোলে ঘুমোবো বলে তৈরি হচ্ছিলাম। সব জিনিস যেন তৈরি হয়। হলে আরেক দ্রব্য হল। তেমনি করে আমার মাথা ঘুমোয় আর ওর কোল জেগে থাকে। খালি বালতির কড়া খটাস খটাস করে ও আমাকে ঘুম পাড়ায়। এ-পদ্ধতির উদ্ভাবক তিলিনা,…

[প্রমীলা (অংশ) / সুকুমার ঘোষ]

গল্পতন্ত্র ও চাকর সাহিত্য বিরোধী গদ্য ২

গায়ে রূপোলি প্রিন্ট। এলোমেলো জংলি প্রিন্ট। তার উপর রুমালটা। কে রুমালটা সোফার ওপর ফেলে গেছে! এখন জানার উপায় নেই। এখন সোফার ওপর রুমালটা। সোফাটা একপাশে দেয়ালের গায়ে। এটা পেছনের দেয়াল। কোমরের ওপর থেকে তেমনি সাদা দেয়াল। দেয়ালের গায়ে একটা বড় ব্রাকেট। সোফার মাথার কিছু ওপরে ব্রাকেটটা। ব্রাকেটে বিশেষ কিছু নেই। ব্রাকেটের ভেতর দিয়ে দেয়াল দেখা যায়। সাদা দেয়াল। ব্রাকেটের চারপাশে সাদা দেয়াল। ঘরের পেছনের দেয়াল। দেয়ালের একপাশে দরজা। এই দরজা দিয়ে ঘরে আসতে হয়। এই দরজা দিয়ে ঘরের বাইরে যেতে হয়। এই দরজায় দাঁড়িয়ে পুরো ঘরটা দেখা যায়। এখন পুরো ঘরটা দেখা যাচ্ছে। ঘরের জিনিষপত্র দেখা যাচ্ছে। ঘরের চার দেয়াল দেখা যাচ্ছে। মেজে দেখা যাচ্ছে। ছাদ দেখা যাচ্ছে। মেজের সমান মাপের ছাদ। ছাদ থেকে একটা সিলিং ফ্যান

ঝুলছে। ঘুরছে না। সুইচ্ টিপলে ঘুরবে। একটা বাল্ব্ ঝুলছে। জ্বলছে না। সুইচ্ টিপলে জ্বলবে। সুইচ্ বোর্ডটা দরজার কাছে। সেই দরজাটা। ভেতরে আসার দরজা। বাইরে যাবার দরজা। দরজাটা খোলা। দরজার পাল্লা দুটো খোলা। একটু টানতেই বন্ধ হয়ে গেল। এখন পাল্লা দুটো বন্ধ। এখন দরজা বন্ধ। এখন ঘরে কেউ নেই। এখন একটা ঘর।

[স্টিল লাইফ (অংশ) / সুনীল জানা]

ঞ. নতুন নিয়ম গদ্য ১

প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর আমাদের মূর্খগণনা বিভাগ মূর্খদের গণনার কাজে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। পাঁচ বছরের ব্যবধানে মূর্খদের সংখ্যা কত থেকে কত হয় এবং কোন জাতের মূর্খ ঠিক কতখানি বর্তমান সেইদিকে লক্ষ্য রাখাই এই বিভাগের কর্তব্য।

প্রচণ্ড পরিশ্রম. এবং অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে এই বিভাগের কর্মীদের চার পাঁচ মাস সময় কাটাতে হয়। সাধারণতঃ এই গণনার কাজ শুরু হয় বর্ষার পরে। এবং কাজ চলে প্রায় শীত পর্যন্ত। বিভাগ শীতকালের মধ্যেই মূর্খদের ওপর চূড়ান্ত রিপোর্ট কর্মীদের কাছ থেকে পেয়ে যায়। তারপর এই রিপোর্ট বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা হয়। শীতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় যখন সাধারণ মানুষ এই রিপোর্ট জানে তখন অনেকেই লজ্জায় এবং অপমানে শীতের পোশাকে মুখ ঢাকতে চেষ্টা করে। লজ্জা এবং অপমানে এমনকি এক একজনের মুখ থেকে শীতের গরম সাদা ধোঁয়া পর্যন্ত বেরনো বন্ধ হয়ে যায়। হাতে যদি কারোর শীতের কোন লম্বা ছুটী থাকে অনেকেরেই সেই ছুটী মাটি হয়ে যায়। ছুটী খরচের জন্য ছুটীর তালিকা থেকে কেউ কেউ ভ্রমণকে কেটে দেয়। কেউ কেউ এমকি কেটে দেয় নারীসঙ্গও। কেউ আবার জমাটি আড্ডা এবং ঘরোয়া খেলাও কেটে ফেলে। হাতে শুধু তাদের মূর্খ চিন্তাই ধরা থাকে। ছুটীর তালিকায় তখন মুর্খচিন্তাই লেখা থাকে।

[মূর্খগণনা (অংশ) / তীর্থঙ্কর নন্দী]

নতুন নিয়ম গদ্য ২

এই পোড়ামাটির নগরীতে মাঝে মাঝে রাজদূত আসেন

স্বাগতম

এই পোড়ামাটির নগরীতে মাঝে মাঝে রাজকুমারী আসেন

স্বাগতম

এই পোড়ামাটির নগরীতে মাঝে মাঝে রাষ্ট্রনায়ক আসেন

স্বাগতম

এবং উপস্থিত অতিথি অভ্যাগতদের তালিকার চিত্রতারকার জন্য মুষ্টিযোদ্ধার জন্য গায়িকার জন্য কবির জন্য বিপ্লবীর জন্য বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সমিতির সভাপতির জন্য বর্তমান বছরের বিশ্বশান্তি পুরস্কার বিজয়ীর জন্য প্রাক্তন আন্তর্জাতিক সুন্দরীর জন্য মহাকাশচারীর জন্য

স্বাগতম স্বাগতম স্বাগতম

[পোড়া প্রদর্শনী (অংশ) / পার্থ গুহবক্সী]

ট. গাণিতিক গদ্য ১

আমার একটা তেপায়া জানলা আছে। তেপায়া মানে তিন পায়ের, তিন ঠ্যাংগের অথবা তিন টেংরীর। জানলাটার চারটে পাল্লা আছে। দুটো দুটো। মুখোমুখি। গলাগলি। দুটো খোপ। খোপে খোপে গ্রীল। গ্রীলে পদ্ম পাতা। কুঁড়ি, ফুল। তার বাইরে রাস্তা। রাস্তার ওপারে বাড়ি। বাড়ির ওপারে বাড়ি। তার ওপারে বাড়ি। তারও ওপারে বাড়ি। হয়তো তারও ওপারে বাড়ি আমি ঠিক জানি না।

জানলাটায় দুটো খোপ আছে। ডান এবং বাঁ। বাঁ খোপ দিয়ে বাঁদিকটা দেখি, ডান খোপটা দিয়ে ডান দিকটা। কখনো বাঁ খোপ দিয়ে ডানদিকে অথবা ডান খোপ দিয়ে বাঁ দিক দেখি না। একবার দেখেছিলাম দেখে চিনতে পারি নি। আমার জানলার নীচে রাস্তা রাস্তার ওপাশে বাড়ি।

[তেপায়া জানলা (অংশ) / চিরঞ্জয় চক্রবর্তী]

গাণিতিক গদ্য ২

আমি এখন হামাগুঁড়ি দিই শরীরটাকে বেঁকিয়ে পা-দুটোকে ভাঁজ করে, হাতের দুটো পাতা পায়ের দুটো হাঁটুর উপর সমস্ত শীরের ভার রেখে, আমি হামাগুঁড়ি দিই। হামাগুঁড়ি দিয়ে এ-ঘর থেকে ও-ঘর যাই, ঘর থেকে বারান্দায় যাই, সিঁড়ি ডিঙিয়ে ছাদে উঠে আসি, সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় নেমে আসি। পাশাপাশি লোকজনকে কাটিয়ে, সামনের গর্ত ডিঙিয়ে, সামনের নর্দমা পেরিয়ে, ডানদিকে ঘুরে, বাঁদিকে ঘুরে, সোজা গিয়ে, আমি এখন হামাগুঁড়ি দিই।

[চলন বদল (অংশ) / অনুপ সেনগুপ্ত]

ঠ. মালোভী কবিতা

ঘরে নেই ভাত কাম্বন শেখাও,
আমাদের চাই খাবার ;
জবাব না দিয়ে পুলিশ পাঠাও ;—
হুঁশিয়ার সরকার।

ছেঁদো আইনের বেড়াজাল ছিঁড়ে
দেখেছি তোদের রূপ
কাগুজে বাঘের ডোরা দাগ দেখে
আমরা থাকি না চুপ।

ভারতবর্ষে অশ্বত্থ গাছে
কাঁপে থির থির পাতা
ঝড় উঠবে জেনেই গাছেরা
সটান তুলেছে মাথা।

গ্রাম জড় করে বুড়ো ডাল পালা
শ্মশান সাজাবে বলে,
দুশমনদের ফাঁদে ফেলে দূরে
পোড়াবেই জঙ্গলে।

তাইতো অযথা ক্লান্তি মানি না
অশান্ত জীবনের ;
বুকের রক্তে অত্যাচারের
আমরা মেটাবো জের।

(রাজার অসুখ / মলয় আদক)

ড. সমন্বয় ধর্মী গদ্য

আমি চলে যাবো। আলবাৎ চলে যাবো। কিছুতেই থাকবো না। থাকতে আমার ভাল লাগে না। কেন লাগবে? ভাল লাগার কি আছে। সবকিছু একঘেঁয়ে। বৈচিত্র্যহীন। বাসে ট্রামে ভীড়। ট্যাক্সিতে যাবার পয়সা নেই। ভীড় ঠেলে ঠেলে অফিস। অফিসে ঢুকে সই। সই না করলে লাল কালির আঁচড়।

হাজিরা খাতায় সই না হলে মাইনে কাটা। না হলে ছুটির দরখাস্ত দিলে হবে। দরখাস্ত দিলেই ছুটি মঞ্জুর হবে তার কোন মানে নেই। কত রকমের কৈফিয়ৎ দিতে হতে পারে। কত কথা বলতে হবে। শব্দের পর শব্দ। বড়সাহেব ডেকে বলতে পারেন—এবারের মতো আপনার ছুটি মঞ্জুর করলাম ভবিষ্যতে আগে থেকে না জানিয়ে কামাই করবেন না। ভবিষ্যতে যে এরকম হবে না এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। ছুটি মঞ্জুর হলেই যে সঙ্গে সঙ্গে মাইনে হবে এমন কথাও কেউ বলতে পারে না। বিল ক্লার্ক থেকে আরম্ভ করে ক্যাশিয়ার পর্যন্ত অনেক ঝক্কি পোয়াতে হবে। বেঁচে থাকার সমস্যা অনেক।

[চলে যাবো (অংশ) / অজিত দেব]

ঢ. থার্ড লিটারেচার গদ্য

[সংবিধানের পৃষ্ঠা ওলটাতে ওলটাতে কে যেন কতগুলো পেন্সিলের দাগ দিয়ে ছিলেন।

এই রকম একটি জায়গা :—

All citizens shall have the right—

1. Freedom of speech and expression

2. More freely throughout territory

3. Reside and settle in any part of the territory

নীচে টীকা টিপ্পনী=* **Absolute individual rights can not be guaranteed by any modern state :** !!! ???.

এই অজ্ঞাত রসিক অথবা দুষ্কৃতকারী যেই হন না কেন কোন উপায়ে তাকে গ্রেপ্তার করা গেল, তাকে বিচারক সাজিয়ে পক্ষে এবং বিপক্ষে এই গল্পটি যেন দুইবার পাঠ করা হয়।]

যন্ত্রণার ভারী ছায়া ফেলে একটা লোকাল ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে ষ্টেশনে। কয়েক জন ডেলিপ্যাসেঞ্জার বসে গুলতানি করছেন। এদের কেউ পাড়ায় কংগ্রেস অফিসে, সি. পি. এম্. করা নেতা, কেউ গেরুয়া ডাক্তার, কেউ পদ্যকার হলেও হতে পারেন। সন্তান সন্ততিকল্প কেরানীর ঘামের গন্ধে গুলতানি নাকি স্বাস্থ্যকর। এই আড্ডা-টুকুর জন্য সারাদিন মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়েন; তিলি পাত্র চাই থেকে রিডাকসন সেলে স্টীলের বাসন পর্যন্ত সব গড গড় কোরে বলে দিতে পারেন।...

…রাশিয়ার তিরিশটা মেয়ের নাম ইন্দিরা……হে-হে পি-থ্রি'র জাজিয়া নাকি রেকর্ড পরিমাণ সেল,……রাত্রে ঠাণ্ডা বাড়বে……বিরোধীরা আন্দোলনে নামবে কিনা ভাবছে……হাফ্‌ দামে শংকরের উপন্যাস ২৫,০০০ কপি বিক্রী……হাওড়া হাসপাতালে এক রোগী বেঁচে প্রমাণ করলেন তিনি মরেন নি……'।

[এটি একটি গোলাকার গল্প (অংশ) / সমর গঙ্গোপাধ্যায়]

পরিশিষ্ট ২

ঋণ স্বীকার

১. বাংলা সাময়িক সাহিত্য। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮১৮-১৮৬৭ বিশ্বভারতী

২. কবিতা শুধু কবিতার জন্য। প্রভাতকুমার দাস। মাঝি, নভেম্বর ১৮৮২

৩. আধুনিক কবিতা 'নিরুক্ত' আন্দোলন। প্রভাতকুমার দাস। হার্দ্য

৪. হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন। উত্তম দাশ। মহাদিগন্ত জানুয়ারি

৫. ইস্তাহার। মলয় রায়চৌধুরী

৬. হাংরি জেনারেশনের বিভিন্ন সংখ্যা

৭. 'শ্রুতি' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা

৮. 'সাম্প্রতিক' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা

৯. প্রকল্পনা গোষ্ঠীর 'স্বতোৎসার', 'প্রকল্পনা সাহিত্য', 'কবিসেনা'র বিভিন্ন সংখ্যা

১০. 'টাইরেসাস' পত্রিকার ১ম সংখ্যা

১১. 'কবিপত্র প্রকাশ' এর বিভিন্ন সংখ্যা

১২. 'অস্ত্রী' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা

১৩. উত্তর আধুনিক কবিতা, সম্পাদনা অমিতাভ গুপ্ত আলোচনাচক্র

১৪. " " " দ্বিতীয় সংস্করণ

১৫. উত্তর আধুনিক চেতনার ভূমিকা, অমিতাভ গুপ্ত ত্রিরত্ন প্রকাশনা সেপ্টেম্বর

১৬. সাম্প্রত, লাল নক্ষত্র, ক্যাকটাস, আলোচনাচক্র জনপদ, প্রমা পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা

১৭. 'নিম সাহিত্য' বিভিন্ন সংখ্যা

১৮. 'বোধ' জানুয়ারি '

১৯. 'এবং নৈকট্য' বিভিন্ন সংখ্যা

২০. 'গল্প', 'চোখ' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা

২১. 'ছাঁচ ভেঙে ফেলো' পত্রিকা

২২. 'এই দশক' শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য বিভিন্ন সংখ্যা

২৩. সমন্বয়-ধর্মী গল্প পত্রিকা

২৪. 'নতুন নিয়ম' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা

২৫. 'ছয়' গাণিতিক পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা

২৬. 'অমৃতলোক' গল্প সংখ্যা

২৭. বাংলা ছোট গল্প : ভিন্নরীতি সুমিতা চক্রবর্তী, কৌরব জানুয়ারি

২৮. আমি ও আমার সমসাময়িক কয়েকজন / অঞ্জন কর, সমকালীন কোরাস, জানুয়ারি

২৯. গদ্য-পদ্য আন্দোলনের দলিল। সত্য গুহ।